একুশ বছর বয়েসে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

— হ্যালো, মাসীমা বলছেন ? মাসীমা, আমি পিয়া–বাবুজীর মাস্টারমশাই।

— হ্যাঁ, কী ব্যাপার ? বলুন —

মাসীমা, আমি আমাদের পাশের বাড়ি থেকে ফোন করছি, আমার হঠাৎ একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

— অ্যাঁ তাই নাকি? কী হয়েছে ? ওঃ, আজকাল চারদিকে যা হচ্ছে না। এত সব খারাপ খারাপ খবর শুনছি— কী হয়েছে আপনার ?

— সে রকম কিছু না। মানে, আমার বইয়ের আলমারিটা হঠাৎ উল্টে পড়ে গিয়ে —

— মাথায় লেগেছে ?

— না। মাথায় না। ঠিক সময় মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিলাম, আমার পায়ের ওপর।

— উঃ! ভেঙে গেছে ? কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার ?

— না, এমনই, খুব ব্যথা।

— এক্স–রে করিয়েছেন ? করান নি ? আপনি কি পাগল ? এই সব ব্যপারে দু' একদিন নেগলেক্ট— করলেই— কোন ডাক্তার।

— আমাদের পাড়ার ডাক্তার দেখিয়েছেন ?

— নর্থ ক্যালকাটায় ভালো ডাক্তার আছে ? ইয়ে, না, আছে নিশ্চয়ই, শুনুন, আমার মাসতুতো ভাই ছোট্কু খুব বড় ডাক্তার, ঐ যে পি জি'র ডাঃ এন সি চ্যাটার্জি, মেডিসিনের হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট — ওকে দেখাবেন ? ছোট্কুকে বলে দেবো আপনার বাড়ি যেতে ?

— না, না, মাসীমা, সেরকম কিছু ব্যাপার নয়, আমার ধারণা শুধু মচ্‌কে গেছে, তিন চারদিন রেস্ট নিলেই।

— একদম বাড়ি থেকে বেরুবেন না! কোন্ পা ?

— ইয়ে···· ডান পা।

— উফ্, খুব লেগেছিল নিশ্চয়ই ? শুনুন, ঐ ডান পায়ের ওপর কোনো রকম স্ট্রেইন যেন না পড়ে···আমার ছোটকাকার ছেলে বাবলু, এখন ফিনান্সের সেক্রেটারি, ও ছোটবেলায় ফুটবল খেলতে গিয়ে পা ঐ রকম ভেঙেছিল, তখন ভালো করে চিকিৎসা করে নি, এতদিন পর সেখানে ব্যথা শুরু হয়েছে ···আপানি প্লাস্টার করিয়েছেন ?

— না, মাসীমা, প্লাস্টার বোধ হয় করতে হবে না, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রেখেছি···· তাহলে তিন–চারদিন তো যেতে পারছি না—

— তিন–চারদিনে সারে কখনো ? অন্তত সাতদিন কমপ্লিট রেস্ট, শুনুন, আমার কথা শুনুন, একদম নেগলেক্ট করবেন না, পরে ওর থেকে যে কী হয়···· ।

— মাসীমা, পিয়াকে বলে দেবেন, ওকে হোম–ওয়ার্ক দিয়ে এসেছি, যেন করে রাখে, আমি যদি চার–পাঁচদিন পরে যাই, তখন দেখবো। আর বাবুজীকে বলবেন 'মেঘনাদ বধ' থেকে যেন আরও এক পাতা মুখস্থ করে—

— হ্যাঁ, ওরা পড়াশুনা করে একেবারে উল্টে দেবে! ঠিক আছে আপনি ভালো হয়ে আসুন তো, আর শুনুন, সাবধানে থাকবেন কিন্তু। একবার আমার মেজদা, ঐ যে যিনি কর্নেল····।

— হ্যাঁ, মাসীমা। আচ্ছা মাসীমা, নিশ্চয়ই, হ্যাঁ। না, না, তা করবো কেন। হ্যাঁ,····হ্যাঁ··হ্যাঁ। আচ্ছা, মাসীমা,— এইবার রাখি ?

আমাদের শ্যামবাজার পোস্ট অফিসে টেলিফোনের কোনো আলাদা জায়গা নেই। যে ভদ্রলোক টেলিগ্রাম নেন, তাঁর পাশেই টেলিফোন আগাম পয়সা দিলে তিনি নিজেই ডায়ালের নম্বর ঘুরিয়ে দেন।

সেই ভদ্রলোক গালে হাত দিয়ে এক মনে আমার কথা শুনছিলেন।

আমার পিছনে দাঁড়িয়ে একটি গোলাপী রঙের শাড়ি পরা মেয়ে।

বি–এ ক্লাসের ছাত্রী বলে মনে হয়। ওপরের ঠোঁটে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে গোঁফ হয়ে আছে। নিশ্চয়ই কোনো প্রাণের বন্ধুকে ফোন করবে। তাই চোখের পাতায় অধৈর্য। বাকি মুখখানা সুগম্ভীর। এই বয়েসী মেয়েরা একলা পোস্ট অফিস, রেল স্টেশন কিংবা সিনেমা হলে এলে শুধু গম্ভীর নয়, মুখখানা কঠোর করে রাখে। যেন সামান্য একটু হাসাও পাপ। অথচ এই মেয়েটিই নিশ্চয়ই নিজের কলেজের কমনরুমে কথার ফুলঝুরি ছুটায়।

মেয়েটি আমার আপাদমস্তক দেখে, বিশেষত আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে এমন একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি হানলো, যেন আমার মতন মিথ্যেবাদী সে ভূ–ভারতে দ্বিতীয় আর একটি দেখেনি! মেয়েরা যেন কম মিথ্যে কথা বলে!

কাউন্টারের বাবুটি বললেন, তিন মিনিটের বেশি হয়ে গেছে, দুটো কলের দাম দিন!

পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করে দিয়ে বললুম, ধন্যবাদ।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে উৎপল , আশু আর ভাস্কর। আমি কাছে যেতেই ভাস্কর বললো, তুই একটা ইডিয়েট! পা ভেঙে গেছে, আর তুই সেই ভাঙা পা নিয়ে পাশের বাড়ি গিয়ে ফোন করলি কী করে ?

উৎপল বললো, হাত ভাঙা উচিত ছিল!

আমি বললুম, হাত–ভাঙা চট্ করে সারে না। পায়ের ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যায় না, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটলেই হয়।

ভাস্কর বললো, বইয়ের আলমারি ? তুই আর কিছু খুঁজে পেলি না ? একটা ভালো মতন গল্পও বলতে পারিস না ?

আমি বললুম, ঐ ঠিক আছে। ঐ মাসীমা এত ভালো, যা শুনবেন, তাই বিশ্বাস করবেন!

আশু বললো, চল্ তাহলে, টিকিট কেটে আনি!

কিন্তু আরও দুটো জায়গা বাকি আছে। মিত্তিরদের বাড়িটা আমাদের পাড়ার কাছে। ওখানে এই গল্প চলবে না। — ফোনে আমার পা ভাঙার কথা বললেই বোধ হয় আমার ছাত্র

আমার বাড়িতে দেখতে আসবে কিংবা লোক পাঠাবে। আর ভবানীপুরের বাড়িটাতে ফোন নেই।

যে-ছেলেটি মানি-অর্ডারের ফর্ম লেখে, তার কাছে গিয়ে বললুম, ভাই, এক টুকরো সাদা কাগজ হবে?

কাগজটা নিয়ে তাতে লিখলুম : শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমার ঠাকুমা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি আছেন বহরমপুরের কাকার বাড়িতে। আমার ঠাকুমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। বোধহয় আর বাঁচবেন না, আমাকে শেষ দেখা দেখতে চেয়েছেন, তাই আমি আজই বহরমপুর চলে যাচ্ছি। আশা করি তিন-চারদিনের মধ্যেই ফিরতে পারবো। বাবলুকে বলবেন, ইতিহাস আর ইংরেজি যেন ভালো করে রিভাইজ করে রাখে। আমি ফিরে এসে ঠিক মেক-আপ করে দেবো। কোনো উপায় নেই বলে আমায় এমন হঠাৎ চলে যেতে হচ্ছে। ইতি, বিনীত, বাবলুর মাষ্টারমশাই।

উৎপল প্রথমে চিঠিটা পড়লো! তারপর বললো, হ্যাঁ, ভালো হয়েছে লেখাটা, বেশ কন্ভিনসিং। তুই কত বড় পাষণ্ড রে, নিজের ঠাকুমাকে হঠাৎ মুমূর্ষু বানিয়ে ফেললি?

আমি বললুম, ধ্যাৎ! আমার ঠাকুমা কবে মরে গেছেন। তাকে আমি চোখেই দেখিনি। তাঁকে আবার মুমূর্ষু বানালে কোনো দোষ আছে?

ভাস্কর বললো, এবার ফিরে এসেও তোর ঠাকুমাকে মেরে ফেলিস নি। আবার বাঁচিয়ে তুলিস, পরে আবার কাজে লাগতে পারে।

উৎপল বললো, মেরে ফেললেই অশৌচ-ফশৌচের ব্যাপার দেখতে হবে।

আশু একটু ভালো ছেলে ধরনের। সে এই সব ব্যাপার ঠিক পছন্দ করতে পারছে না, চুপ করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে।

চিঠিটা ভাঁজ করে ভাস্করকে বললুম, তুই এটা মিত্তিরদের বাড়িতে দিয়ে আয়।

ভাস্কর বললো, মাথা খারাপ। আমি ও বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারবো না! কুকুর আছে!

— তোকে ভেতরে ঢুকতে হবে না। গেটে দারোয়ানকে দিয়ে এলেই হবে।

ভাস্কর চিঠি দিতে গেল, আমরা ঢুকলুম মলয় গ্রীলে চা খেতে। ভবানীপুরের বাড়িটাতে আর কিছু করা যাবে না। ওখানে এমনিই ডুব মারতে হবে, না বলে কয়ে।

উৎপল সিগারেটের প্যাকেটটা বার করতেই আশু চাপা গলায় বললো, এই ধীরেশবাবু····।

সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেটটা চলে গেল টেবিলের নিচে। এ পাড়ায় আমাদের নির্ভয়ে সিগারেট টানার উপায় নেই। কাছেই একটা স্কুলে আমরা পড়েছি। আমরা ছিলুম সেই ইস্কুলের দুর্দান্ত, ডানপিটে ব্যাচ, তাই সব মাস্টারমশাইরা এখনো মনে রেখেছেন আমাদের।

ধীরেশবাবু একেবারে পেছন দিকটায় টেবিলে বসে একা চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছেন। চোখাচোখি হলেই প্রণাম করতে হবে। ভাস্কর আসবার আগেই তাড়াতাড়ি চা শেষ করে উঠে পড়লুম আমরা।

ভাস্কর চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়বার জন্য আর্টিক্‌ল্‌ড ক্লার্ক হয়েছে। উৎপল এক বৃটিশ কোম্পানীতে অফিসার্স ট্রেনী হিসেবে ঢুকেছে, আর আশুদের নিজস্ব ব্যবসা আছে। একমাত্র আমিই বেকার। লোকের কাছে সে কথা স্বীকার করি না অবশ্য, অন্যদের বলি, আমি হায়ার

ম্যাথ্‌মেটিক্‌স নিয়ে রিসার্চ করছি। যদিও আই. এস. সি'র পর আর, কোনোদিন আমি অঙ্কের মুখও দেখিনি। কিন্তু বেকারজীবনে টাকা-পয়সার ব্যাপারটা ম্যানেজ করা হায়ার ম্যাথমেটিক্‌স ছাড়া আর কী?

গোবিন্দবল্লভ পন্থ মারা যাবার জন্য আজ ছুটি, কাল শনিবার, পরশু রবিবার, সোমবার আবার মহররম। উৎপল-ভাস্কররা টানা চারদিন ছুটি পেতে পারে। সুতরাং এই চারদিন কলকাতায় থাকার কোনো মানে হয় না। মুশকিলটা শুধু আমাকে নিয়েই, টিউশানিতে নিজের ইচ্ছে মতন একটানা চারদিন ছুটি নেওয়া যায় না। এতে ক্যাজুয়ল লীভ আছে, আর্নড লীভ নেই।

বহরমপুর নয়, যাবো বেহরামপুর। হাওড়া স্টেশনে এসে আমি বন্ধুদের মাঝখানে লুকিয়ে লুকিয়ে হাঁটতে লাগলুম। আমার মুখে একটা চোর চোর ভাব। চেনাশুনো কেউ আমাকে দেখে ফেললেই মুশকিল!

ট্রেনে ওঠার পর একেবারে নিশ্চিন্ত।

থার্ড ক্লাস কামরাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম, সব্বাই ভিন্ন গ্রহের অধিবাসী। এবার চালাও পান্সী বেলঘরিয়া!

বেহরামপুর থেকে বাস। গোপালপুর অন্-সী-তে, উৎপলদের অফিসের ম্যানেজারের চেনা এক ভদ্রমহিলার একটি কটেজ আছে তিনি সেটা ভাড়া দেন।

এই আমার দ্বিতীয় সমুদ্র দর্শন। খুব ছেলেবেলায় একবার পুরীতে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ভালো মনে নেই। কিংবা স্মৃতিতে সেই সমুদ্র বড্ড বেশি অলীক হয়ে আছে। পুরীর সমুদ্রে কি পাঁচতলা বাড়ির সমান ঢেউ ওঠে? স্বর্গপুরীর ঠিক ডানদিকে কি একটা কালো পাথরের আকাশ-ফোঁড়া দুর্গ আছে? অথবা মেঘ ছিল সে রকম! জগন্নাথ মন্দিরের চূড়া থেকে কি জাঙ্গিয়া পরা তরুণী মেমসাহেবরা সমুদ্রে লাফ দেয়? আর একবার পুরী গিয়ে মিলিয়ে দেখতে হবে।

বাস থেকে নেমে আমরা সোজা চলে এলুম সমুদ্রের দিকে। মালপত্র তো বিশেষ কিছুই নেই। শুধু একটা করে কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ। গোপালপুরের সমুদ্রকে প্রথম দেখেই বুকটা ধক্ করে উঠলো। কলকাতায় বসে তো সপ্তাহে একবার- দু'বার সমুদ্র দেখিই! হলিউডের সিনেমায়! কিন্তু সে দেখার সঙ্গে এ দেখার কোনো তুলনাই চলে না। এত বিরাটের সামনা-সামনি এসে পড়লে মনটা হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

দুপুর তিনটে। অথচ বেলাভূমিতে আর একটাও লোক নেই। এদিক-ওদিক যেদিক চাই একেবারে ধু-ধু, এত সুন্দর একটা সমুদ্র পড়ে আছে, অথচ কেউ তা দেখতে আসে নি? শুধু কলকাতা থেকে এসেছি আমরা চারজন? সমুদ্রের বুকে, বেশ দূরে, মোচার খোলার মতন কয়েকটি নৌকা। আমার পূর্বপুরুষ একদিন ঐরকম একটা নৌকায় চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল।

তখুনি স্নান করার সিদ্ধান্ত হয়। জলের কাছে এসে যারা শুধু জলের রূপ দেখে, আমরা তাদের দলে নই। আমরা শারীরিক প্রেমে বিশ্বাসী। জলকে আলিঙ্গন না করলে ঠিক ভালোবাসাবাসি জমে না। বিশেষত আমি গত বছরই সাঁতার শিখেছি, জলে নামায় আমার বেশি উৎসাহ।

জামা-প্যান্ট খুলে, শুধু আণ্ডারওয়্যার পরে আমরা নেমে গেলুম হৈচৈ করে। ছোট ছোট ঢেউ, অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়া যায়।

ভাস্কর বললো, এদিকে যদি সোজা সাঁতার কেটে যাই, তা হলে কোথায় পৌঁছোবো বল্ তো ?

আশু বললো, অস্ট্রেলিয়া।

— চল্, তাহলে অস্ট্রেলিয়া চলে যাওয়া যাক্।

আমি বললুম, আর একটু গেলেই তো উত্তর মেরু।

উৎপল বললো, আচ্ছা দক্ষিণ মেরু সম্বন্ধে অনেক গল্প পড়েছি, তাই না ?····কিন্তু উত্তর মেরু সম্পর্কে সে রকম কোনো গল্প শুনি না কেন ?

— উত্তর মেরু আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে।

— যেতে হবে, একদিন যেতে হবে।

— উই আর দা মিউজিক মেকার্স, উই আর দা ডিমার্স অব ড্রিম্‌স···

কটেজটির মালিক— মহিলাটি একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দেখে আমি একটু দমে গেলুম। এই রে, সর্বক্ষণ ইংরেজি বলতে হবে।

ভদ্রমহিলা যথেষ্ট বুড়ি, ছোট্ট-খাট্টো চেহারা, মাথার চুল ধপধপে সাদা। চোখের মণি নীল, এমনই নরম-সরম চেহারা যে দেখলে মানুষ বলে মনে হয় না, যেন একটা কাচকড়ার পুতুল। একটা গোলাপ ফুল ছায়া গাউন পরে আছেন।

ভাস্করকে আমাদের দলের নেতা বানিয়ে দিলুম। অকুতোভয়ে এমন গড় গড় করে ভুল ইংরেজি আর কেউ বলতে পারে না আমাদের মধ্যে। ইংরেজি বলার সময় ভাস্করের উপরের ঠোঁটটা ফুলে ওঠে। ওটা সাহেবি কায়দা।

চারখানা ঘর, মাঝখানে ছোট একটি লাউঞ্জ, সামনে বাগান। বেশ সুন্দর বাড়িটা। প্রত্যেক ঘরে দু'জনের বেশি থাকবার নিয়ম নেই। কিন্তু আমরা চারজনই থাকতে চাই এক ঘরে। ভদ্রমহিলা কিছুতেই রাজি নন্, বারবার মাথা নেড়ে বলছেন, না, না, তোমাদের অসুবিধে হবে, কেন কষ্ট করে থাকবে, ঘর তো ফাঁকা রয়েছে— । কিন্তু আলাদা আলাদাই যদি থাকবো, তা হলে আমরা এক সঙ্গে বেড়াতে এসেছি কেন ? তা হলে তো যে-যার নিজের বাড়িতে থাকলেই পারতুম। তা ছাড়া, দুটো ঘরে থাকলে ডব্‌ল চার্জ দিতে হবে না ?

এমন উদ্দাম গ্রীষ্মে বোধ হয় কেউ বেড়াতে আসে না। বেশির ভাগ বাড়িই ফাঁকা। আমাদের কটেজটিতে আর একটি মাত্র ভদ্রলোক ছিলেন, মাঝ বয়েসী, লাউঞ্জে বসে সামনের নিচু টেবিলে তিনি তাস বিছিয়ে পেসেন্স গোনছিলেন। ভিজে চুল নিয়ে আমাদের চারজনকে ঢুকতে দেখে তিনি একবার অবাক ভাবে তাকিয়ে ছিলেন শুধু।

এক ঘন্টা বাদেই ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেল। ওঁর নাম জ্ঞানব্রত রায়চৌধুরী। অফিসের কাজে উড়িষ্যায় এসেছিলেন দু' একদিন সমুদ্রের ধারে কাটিয়ে যাচ্ছেন। বেশ মিষ্টি ব্যবহার ভদ্রলোকের। আমাদের আপনি আপনি সম্বোধন করে সম্মান দিলেন খুব।

সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়লো যে উনি থাকেন সাদার্ন এভিনিউতে, তাঁর বাড়ি থেকে লেক এক মিনিটের রাস্তা, তাঁর দাদার এক ছেলে রোইং করে স্কুলে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। সেই দাদার বাড়ি নিউ আলিপুর।

সাঁতারের প্রসঙ্গ উঠেছিল, তার থেকে রোয়িং, আশু বলেছিল, ও লেকে একবার রোয়িং কমপিটিশানে নেমেছিল, তারপর ভদ্রলোক জানালেন ঐ খবর।

আমি চট করে লাউঞ্জ থেকে উঠে নিজেদের ঘরে চলে এলুম। ভদ্রলোক আমার মুখ যত কম দেখেন, ততই মঙ্গল। সর্বনাশের মাথায় বাড়ি। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়। এই জ্ঞানব্রতবাবু তো পিয়া-বাবুজীর সাক্ষাৎ কাকা! ওঁদের সবার নাম ব্রত দিয়ে, শুভ্রব্রত, প্রিয়ব্রত, পূণ্যব্রত—.। যে রোয়িং চ্যাম্পিয়ন ভাইপোটির কথা উনি বলছেন, সেই তো আমার ছাত্র বাবুজী!

বাঃ, বাইরে আসবার পুরো আনন্দটাই মাটি!

বাইরে ভাস্কররা চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে, আমি বিছানায় শুয়ে খুলে ফেললুম শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস। বাইরে অন্ধকারে লুটোপুটি খাচ্ছে নোনা বাতাস।

—এই নীলু ওঠ! শুয়ে আছিস যে এখন ? এই বাঙালটাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

আমি উঠে বসে উৎপলকে তড়পে বললুম, তোরাই তো বসে বসে একটা বুড়ো লোকের সঙ্গে গ্যাঁজাচ্ছিস! সমুদ্রের ধারে এলুম কি ঘরে বসে থাকার জন্য ?

—দাঁড়া, খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্তিরে যাবো। আজ ভিণ্ডালু হচ্ছে।

—ভিণ্ডালু কি জিনিস ?

—তা জানি না। মিসেস পীবডি বললেন, আজ রাত্রের মেনুতে ভিণ্ডালু আছে। তাই শুনে ঐ জ্ঞানব্রতবাবু বললেন, গুড! এদের খুব ভালো লাগবে।

—বুঝেছি। ভিণ্ডালু মানে ভিণ্ডি আর আলুর ঘ্যাঁট। এরা ঢ্যাঁড়শকে ভিণ্ডি বলে।

তোর মাথা ? তা হলে কি ভদ্রলোক গুড্ বলতেন ?

খাওয়ার টেবিলে আবার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলোই। এখানে সব কিছুই সাহেবী মতে। সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে ডিনার। গেস্টদের এক টেবিলে বসে খেতে হয়। আমি সর্বক্ষণ মুখ গোঁজ করে রইলুম। আমি অসামাজিক, লাজুক, লোকের সঙ্গে মিশতে পারি না, এই রকম একটা ভাব।

ভিণ্ডালু আসলে শর্ষে বাটা দিয়ে রান্না করা মাংস, খেতে ভালোই, তবে এমন কিছু আহা মরি না।

খেয়ে উঠেই ওরা জমে গেল তাস খেলায়। জ্ঞানব্রতবাবুর তাসের নেশা। উৎপলের দারুণ উৎসাহ। প্রেমের ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তি যেমন অবাঞ্ছিত, ব্রীজ খেলায় তেমনি পঞ্চম ব্যক্তি। এবার আর আমি বিছানায় না গিয়ে, কারুকে কিছু না বলে চলে এলুম বাইরে। রাস্তা চেনার ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই ডানদিকেই সমুদ্র।

এমন নির্জন দেশ আমি আগে কোথাও দেখি নি। বাড়ি আছে আলো জ্বলছে, কিন্তু পথে একটাও মানুষ নেই, কোথাও কোনো শব্দ নেই শুধু মাঝে মাঝে হাওয়ার শন্‌শন্‌। সমুদ্রের ধারেও কেউ নেই। তবে এই সৌন্দর্যের সম্ভার কার জন্য ?

জলের একেবারে কাছে বালির ওপর বসবার পর পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া গানের একটি লাইন আমার মনে পড়তে লাগলো বারবার। ...আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে—। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে—। এ লাইনের মানেটা আমার কাছে এখন বদলে গেছে। এই যে সমুদ্র এখানে একলা শুয়ে আছে তার গলায় জড়ানো এত অসংখ্য আলোর মালা, এ যদি এই সময় এসে আমি না দেখতুম, তাহলে তো এই সব আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যেত!

সত্যিই আলোর মালা। কোনো সিনেমাতেও তো সমুদ্রের এই রূপ দেখি নি। একি শুধু গোপালপুরেই দেখা যায় ? সমুদ্র একেবারে নিপাট অন্ধকার, আর ঢেউগুলির চূড়ায় জ্বলজ্বল করছে আলো। জানতুম ফসফরাসের জন্য কখনো কখনো এমন হয়। জানা আর দেখা একেবারে আলাদা। যতদূর চোখ যায় সমস্ত ঢেউ-ই এমন উজ্জ্বল। উৎপল-ভাস্কররা দেখলো না, মরুক গে ওরা তাস খেলে! সমুদ্র নগরীতে এসেছে ঘরে বসে তাস খেলবার জন্য।

একটু একটু ভিজে বালি, তার ওপর আঙুল দিয়ে দাগ কাটা যায়। লেখা যায় নাম। ভীষণ মনে পড়ছে রাণীর কথা । যে-কোনো সুন্দর জিনিস দেখলেই আমার ইচ্ছে করে কারুকে তার ভাগ দিই। যে-কোনো ভালো বই পড়লেই মনে হয়, রাণী এটা পড়বে না। তা কি হতে পারে ? বেহালার একটা বাগানবাড়িতে গত বছর কাঁচা আম মাখা খেয়ে কী ভালো লেগেছিল কী সুন্দর অন্যরকম গন্ধ, আমি একটা কাঁচা আম লুকিয়ে পকেটে নিয়ে গিয়েছিলুম রাণীর জন্য। পরদিন সন্ধ্যেবেলা রাণীর ঘরে ঢুকে হঠাৎ পকেট থেকে সেই কাঁচা আমটা বের করে দেওয়ায় রাণী অবাক চোখে হেসে আকুল! শুধু শুধু একটা কাঁচা আম কি কেউ কারুর জন্য নিয়ে যায় ? বছরের এই সময়টায় প্রত্যেক বাড়িতেই তো বাজার থেকে কাঁচা আম আসে টক রান্নার জন্য। আমার বুকে একটা ছোট কিল মেরে রাণী বলেছিল, কী ছেলেমানুষ!

রাণী বুঝতে পারে নি ঐ আমটা নয়, ওকে আমি দিতে চেয়ছিলাম সেই আলাদা গন্ধটা।

এই নিঃসঙ্গ সমুদ্র, এই অন্ধকার জড়ানো হাওয়া, এই যে অসংখ্য ঢেউয়ের মাথার হীরাকুচি এসব আমি তোমায় উপহার দিলাম, রাণী!

তুমি এখনো নিশ্চয়ই পড়ার ঘরে। পাচ্ছো ও থ্রি-র গন্ধ ? কলকাতার বাতাসে খাঁটি ও টু-ই নেই। তাই তোমায় পাঠিয়ে দিলুম, এই ও থ্রি।

বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকবার পর হঠাৎ কী খেয়াল হলো, এগিয়ে গেলুম জলের দিকে। প্যান্টের পায়ের কাছটা ভিজে গেল। তা যাক, আমার ইচ্ছে হলো ঢেউয়ের ঐ আলো ধরতে। কিন্তু ফসফরাস ধরা যায় না। হাতে নিলেই মিলিয়ে যায়, থাকে শুধু জল।

কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে।

প্রচেতঃ....।

দূর থেকে একটা গান ভেসে এলো, খুব জোরে বলেই একটু বেসুরো...এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না....।

উৎপল গাইছে। আর আশু ডাকছে , নী ...লু। এই নী-লু।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। খুঁজুক না কিছুক্ষণ।

তারপরই অন্ধকার চিরে গেল টর্চের আলোয়। ভাস্কর টর্চ এনেছে। প্রথমেই টর্চ ফেললো সমুদ্রে, তার আলো চলে গেল উত্তর মেরু পর্যন্ত।

এবার ছুটছে ওরা তিনজন। ভাস্কর ঝড়ের মতন আমার পিঠে এসে পড়লো।

আশু বললো, ফ্যানটাসটিক।

ভাস্কর বললো, চ, চ, চ, জলে নামি। জলে নামি!

উৎপল বললো, এই রাত্তিরে। যদি হাঙর-টাঙর আসে।

—ভ্যাট। প্যান্ট-জামা খোল। আণ্ডারওয়্যার জাঙ্গিয়া-ফাঙ্গিয়া সব খুলে ফ্যাল! এখানে দেখবার কেউ নেই।

ভাস্কর আর একটুও ধৈর্য ধরতে পারছে না মুহূর্তে ও নিজের সব কিছু খুলে ফেললো।

তারপর পাঁচ হাজার, সাত হাজার কিংবা চৌদ্দ হাজার বছর আগে মানুষ যে-পোশাকে জলে নামতো সেই ভাবে আমরা দৌড়ে সমুদ্রের মধ্যে চলে গিয়ে শুরু করে দিলুম দাপাদাপি-।

—এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না····।

।। দুই ।।

নীচতলায় কেউ থাকে না, এখানে অফিস ঘর, বাইরের লোকদের বসবার ঘর এবং গুদাম। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে কেন ? দরজা-টরজা সব খোলা, চোর এসে তো চুরি করে নিয়ে যেতে পারে সর্বস্ব!

—রঘু, রঘু!

বয়েসের জন্য একটু কুঁজো হয়ে যাওয়া রঘু বেরিয়ে এলো খাবার ঘর থেকে। এই পরিবারেই নাকি সে কাজ করছে গত পঁয়তিরিশ বছর।

—আসুন মাস্টারবাবু, ঘর খোলা আছে, বসুন!

—বড়িতে কেউ নেই?

—দিদিমণি তো ছিল। কোথায় গেল আবার। বাবু আর মা বেরিয়েছেন।

টানা বারান্দাটা পেরিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে একটা বারান্দা, তার পাশে পড়বার ঘর। একদম আলাদা। দু' পাশে দুটি বইয়ের আলমারি, টেবিলও দুটি, চেয়ার তিনটি। পিঠোপিঠি দুই ভাই-বোন। একজনের টেবিলে অন্য জনের কোনো বই দৈবাৎ থাকলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়! লোরেটো আর সেন্ট জেভিয়ার্স।

বারান্দাটা আমি পার হয়ে গেলুম নকলভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকে বসলুম পিয়ার টেবিলে। বাবুজীর পক্ষে এখন বাড়িতে না থাকাই স্বাভাবিক। দিনের আলো সম্পূর্ণ মিলিয়ে না গেলে খেলার মাঠ পরিত্যাগ করে না।

—এ কি, আপনি এখন এসেছেন ?

শাড়ি পরেছে পিয়া, হালকা নীল রঙের। সদ্য স্নান করা মুখ। চিবুকে দু' এক ফোঁটা জল লেগে আছে। মাত্র মাস ছয়েক ধরে মাঝে মাঝে শাড়ি পরতে শুরু করছে পিয়া। তার বয়েস সতেরো, উত্তর কলকাতার মেয়েরা এর অনেক আগে থেকেই শাড়ি পরে। পিয়া স্কুল

ছেড়ে কলেজে আসবার পর ওর মা একদিন বলেছিলেন, তুই কি আর কোনোদিন শাড়ি পরা শিখবিই না ?

—রঘুদা, মাস্টারমশাই এসেছেন, তুমি আমায় ডাকো নি ? মাস্টারমশাইকে চা–ও দাও নি ?

—না, না, আমি এইমাত্র এলুম।

পিয়া নিজের চেয়ারে বসলো। তারপর ভুরু তুলে দারুণ নিবিষ্ট ভাব করে বললো, হ্যাঁ, মাস্টারমশাই, তিন–চারদিন ধরে ভেবে রেখেছি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো বই–টই খোলার আগে সেই কথাটা বলে নি ?

আমি মনে একটু শঙ্কিত হলুম। আজ আবার কী প্রশ্ন রে বাবা!

গতমাসে পিয়া আমাকে একটা প্রশ্ন করে একেবারে পিলে চমকে দিয়েছিল! সেদিনও বাবুজী ছিল না তখন।

পিয়ার মুখে সব রকম ভাবের ছবি খুব স্পষ্ট ফুটে ওঠে। রাগ অভিমান, দুঃখ, বিস্ময়ের জন্য তার সরল মুখখানি যেন সব সময় আয়না হয়ে আছে। কোনো কিছু সে লুকোতে জানে না! এই সব মেয়েরা সুখী হয়।

মাসখানেক আগে ইতিহাস পড়ার মাঝখানে আমায় হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে পিয়া ওর মুখখানা দারুণ সীরিয়াস করে, কথক নাচের শিল্পীদের মতন ভুরু দুটো ওপরে তুলে বলেছিল, মাস্টারমশাই, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ? কারুকে বলবেন না বলুন—

—কী ব্যাপার?

আগে বলুন, কারুকে বলবেন না ?

—আচ্ছা বলবো না।

—প্রমিস ?

—প্রমিস করতে হবে ? কী এমন ব্যাপার ?

—না। আগে বলুন, প্রমিস ? কিছুতেই কারুকে কোনো দিন বলবেন না ?

—বেশ প্রমিস করলুম।

—আচ্ছা, মাস্টারমশাই ব্রাহ্মরা কি হিন্দু ?

আমি আকাশ থেকে পড়েছিলুম। এটা একটা গোপন কথা। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি। পিয়া ?

—কেন ?

—হঠাৎ এই প্রশ্ন ?

—না আপনি আগে বলুন।

আমি তখন দ্রুত চিন্তা করছিলুম। আসলে ব্রাহ্মণদের ব্যাপারটা আমি নিজেই ভালো জানি না। রবীন্দ্রনাথরা ব্রাহ্ম ছিলেন····একালে আমাদের চেনাশুনা, বন্ধুবান্ধবদের মতো তো কেউ ব্রাহ্ম নেই, তা হলে কি ঐ ধর্মটা উঠে গেছে ? কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে আসবার সময় দেখতে পাই একটা বাড়ির গায়ে লেখা আছে 'ব্রাহ্ম সমাজ', কখানো সেই বাড়িটাতে ঢুকিনি····।

— আপনি বলবেন না তা হলে ?

— এটা কি একটা প্রশ্ন হলো ? ব্রাহ্মরা তো বলতে গেলে হিন্দু ধর্মেরই একটা শাখা····যেমন ধরো বৈষ্ণব, শাক্ত।

— ওরা সরস্বতী পূজো করে ?

— ওঃ হো, না, না, না, ওরা কোনো ঠাকুর দেবতার পূজো করে না। ওরা মূর্তি পুজো মানে না। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করে।

— ব্রাহ্ম বড় না ব্রাহ্মণ বড় ?

এসব যদি ইতিহাস কিংবা সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে কৌতূহল হতো, তা হলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু গোপন কথা হবে কেন?

— কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়।

— আপনি ঠিক জানেন?

— একি তুমি আমায় জেরা করছো কেন, পিয়া ?

— না, ঠিক করে বলুন! ব্রাহ্ম বড়, না ব্রাহ্মণ বড় ?

— বলছি তো, কেউ কারুর চেয়ে বড় নয়।

— আচ্ছা ঠিক আছে। এবার রোমান হিস্ট্রি···

এই রকম হঠাৎ উদ্ভট প্রশ্ন জাগে পিয়ার মাথায়। আজ আবার কী জেগেছে, ····কে জানে!

— আচ্ছা মাস্টারমশাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি; কিন্তু কারুকে কোনো দিন বলতে পারবেন না···।

— বুঝেছি, আবার প্রমিস করতে হবে ?

— হ্যাঁ!

— করলুম।

— আচ্ছা, ভগবান বলে কেউ আছেন, না নেই ?

আবার আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। এটাও গোপন কথা ?

— আচ্ছা পিয়া, তোমার কী ব্যাপার বলো তো ? এসব দারুণ দারুণ সিক্রেট জিনিস তুমি কি করে জেনে ফেলো ?

— না। ঠাট্টা নয়, আপনি বলুন, ভগবান আছেন না নেই?

— তিন–চারদিন ধরে তুমি এটা ভাবছো ?

— হ্যাঁ।

পিয়ার মুখখানা সেই রকম সীরিয়াস, ভুরু দুটি তোলা। পিয়ার ধারণা, পৃথিবীতে কেউ মিথ্যা কথা বলে না। সেইজন্য, আমি যা বলবো তা–ই ও বিশ্বাস করবে। অর্থাৎ আমার একটা মুখের কথায় ভগবানের অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

সদ্য শেষ করা কলেজ জীবনটা স্টুডেন্ট ফেডারেশানের পাণ্ডাগিরি করে কাটিয়েছি, এখনো কফি হাউসে মার্কসবাদ নিয়ে গলা ফাটাই, আমার কাছে ভগবানের কথা! কিন্তু ছাত্র–ছাত্রীদের কাছে একটু ডিপ্লোম্যাটিক হতে হয়।

— কারুর কাছে ভগবান আছেন, কারুর কাছে নেই।

— না। আপনি ঠিক করে বলুন ?

— ঐ তো বললুম। দ্যাখো, রাশিয়া, চীনের লোকেরা আজকাল ভগবান মানে না, আমাদের দেশেও অনেকে মানে না, আবার অনেকে তো মানেও–সুতরাং যে মানে তার কাছে ভগবান আছেন, যে মানে না, তার কাছে নেই।

— তা হলে, যারা ভগবান মানে, তাদের কি উচিত ঘৃণা করা, যারা ভগবান মানে না তাদের ?

— উচিত না, মোটেই ঘৃণা করা উচিত না।

— ঠিক বলেছেন। এবার পড়াশুনো হোক।

ছাত্র–ছাত্রীরা মাস্টারমশাইয়ের কাছে এসব প্রশ্ন তো করতেই পারে। কিন্তু পিয়ার কাছে যে কেন এগুলো এত গোপন কথা সেটাই কিছুতে বুঝতে পারি না।

পিয়াকে সবেমাত্র পড়াতে শুরু করেছি, অমনি বাবুজী এসে হাজির। পিয়ার চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট। জামাটা একেবারে ঘামে ভিজে গেছে, হাতে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট, মুখখানা ঝকঝকে! চমৎকার শরীরের গড়ন বাবুজীর। মাত্র পাঁচ বছর আগে আমি ঐ বয়েসে ছিলুম। কিন্তু এ বাড়িতে ঢুকলেই আমার নিজেকে কেমন যেন বুড়োটে মনে হয়। মাস্টারমশাই তো!

বাবুজী কথা বলে খুব জোরে জোরে। পরপর দুটো পুরো বাংলা সেন্টেন্স সে শেষ করতে পারে না।

— মাস্‌শাই পালে বাঘ পড়েছে! ঐ মেঘনাদবধ কাব্য হ্যাজ বিন ইনক্লুডেড ইন আওয়ার কোর্স। আমাদের ক্লাস টিচার বললেন, ইউ হ্যাভ টু রীড ষষ্ঠ সর্গ ফর দা কামিং টেস্ট।

— তাই নাকি ? বাঃ, তোমার তো খানিকটা পড়াই আছে।

—আচ্ছা, মাস্‌শাই, ঐ লোকটা দ্যাট মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হোয়াই ওয়জ হি বর্ন, ক্যান, য়ূ টেল মী ? সামবডি থেকে মেরে ফেলতে পারে নি ইন হিজ চাইল্ডহুড ?

— হাঃ হাঃ হাঃ।

— আচ্ছা জন্মেছিস না হয়ে বেশ করেছিস, হোয়াট বিজনেস হি হ্যাড টু রাইট দ্যাট হরিড কাব্য ? ইউ টেল মী!

হাঃ হাঃ হাঃ।

— আপনি হাসছেন ? না, আপনি বলুন, ফ্র্যাংকলি, ঐ মনস্ট্রসিটি কোনো সেইন মানুষের হাত দিয়ে লেখা সম্ভব ? ফাস্ট টু টরচার আস দা ইসনোসেন্ট স্টুডেন্টস। ইফ আই উড্ মীট দ্যাট বাগার।

পিয়া ধমক দিল, এই বাবুজী, কী হচ্ছে!

বাবুজী সঙ্গে সঙ্গে হেসে বললো, আই অ্যাম সরি, মাস্‌শাই। আচ্ছা বলুন তো, টেস্টে যদি ওটা থেকে লিখতে হয় তা হলে আমি····।

মাইকেল মুধুসূদন বেঁচে থাকলে তাঁর রচনার এই সমালোচনা শুনে মূর্ছা যেতেন কিনা জানি না। সাধে কি আর বার্নার্ডশ উইল করে গেছেন যে তাঁর কোনো বই যাতে কখনো স্কুল–কলেজের পাঠ্য না হয়।

আইডিয়াটা প্রথমে এসেছিল পিয়া–বাবুজীর মায়ের কথায়। ছেলে মেয়ে দু'জনেই বাংলা জানে না, পিয়া তবু বাংলায় কথা বলতে পারে, বাবুজী তাও পারে না, বাংলায় বই পড়ার তো প্রশ্নই নেই। কিন্তু সিনিয়র কেম্ব্রিজে বাংলা ওদের সেকেণ্ড ল্যাঙ্গোয়েজ হলেও পাস তো করতেই হবে। সেজন্যই তিনি হঠাৎ দুম্ করে একদিন বললেন, মাস্টারমশাই, ওদের আপনি মেঘনাদবধ কাব্যটা পড়ান তো। নইলে একদমই বাংলা শিখবে না!

যারা বাংলায় শুদ্ধ করে কথা বলতেই জানে না, তাদের জন্য প্রথমেই মেঘনাদবধ কাব্য?

পিয়া একদিন আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা মাস্টারমশাই, সাঁড়াশী মানে কী?

আমি সত্যিই চমকে উঠেছিলাম। বাঙালীর মেয়ে, সাঁড়াশী কাকে বলে তাই জানবে না? তা ছাড়া সাঁড়াশীর আর কোনো প্রতিশব্দ নেই? কী করেই বা বোঝাবো?

— কোনাদিন রান্নাঘরে ঢোকে নি বুঝি? দেখো নি, গরম সমপ্যান বা ডেকচি যেটা দিয়ে ধরে তোলে···সাঁড়াশী চেনো না, ছি!

সামান্য একটু বকলেই পিয়ার মুখখানা ম্লান হয়ে যায়। সে বলেছিল, আপনি এই কথা বললেন, মাস্টারমশাই? জানেন, আমাদের ক্লাসের পারমিতা ঝঞ্ঝা মানে জানে না? কিন্তু আমি জানি, ঝঞ্ঝা মানে ঝড়। রবীন্দ্র সঙ্গীত আছে, ঝনঝঞ্ঝার ঝংকারে···।

পাশ থেকে বাবুজী বলেছিল, আমিও ঝড় মানে জানি। ঝড় মানে স্টর্ম, ব্লিজার্ড, টাইফুন, সাইক্লোন, হারিকেন ····।

বাবুজী যে-সব ইংরেজি অ্যাডভেঞ্চার গল্পের বইগুলো পড়ে, তাতে ঝড়ের ইংরিজি প্রতিশব্দ অনেক থাকে।

এদের পড়াতে হবে মেঘনাদবধ কাব্য! পরদিই মাসীমা একখানা মাইকেল রচনা সংগ্রহ কিনে এনে বলেছিলেন, এই নিন, আজ থেকেই শুরু করে দিন।

এই সর্বনাশা পরামর্শ ওঁকে কে দিয়েছিল কে জানে। আসলে আমিও মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলুম। আমি নিজেই কি ছাই মেঘনাদবধ কাব্য কখনো পড়েছি নাকি পুরোটা? বিদ্‌ঘুটে সব শব্দ আছে ওর মধ্যে, ইরম্মদ, বীতিহোত্র, মহোরগ দ্বিরদ–রদ···এইসব কথার মানে জিজ্ঞেস করলেই হয়েছে আর কি। মাস্টার হয়েছি বলেই কি সব–জান্তা হতে হবে।

অবশ্য সেরকম কিছু বিপদ ঘটেনি। বাবুজী প্রথম তিন লাইন অতি কষ্টে পড়েই বইটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, আই ভ্যালু মাই প্রেশাস্ টীথ, মাসশাই, এগুলো পড়ে আমি ভাঙতে চাই না। সরি, মা যাই বলুক, ইমপসীবল ফর মী। আর পিয়া যত্ন করে আট–দশ লাইন পড়ে খুব করুণ মুখ করে বলেছিল, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। মাস্টারমশাই? হিব্রু না ল্যাটিন ····।

এরপর থেকে অন্যসব পড়াগুলো শেষ হলে আমিও রোজ ওদের দু'তিন পাতা ঐ বই থেকে পড়ে শোনাই। সরল করে মানেটা বুঝিয়ে দিই। গল্পটা শুনতে ওরা পছন্দই করে কিন্তু এতে ওদের কতটা বাংলা শেখা হচ্ছে কে জানে।

বাবুজী হাত–মুখ ধুয়ে, পোশাক পাল্টে এসে পড়তে বসলো।

ছেলেটির স্মৃতিশক্তি সাংঘাতিক, কিন্তু বড্ড ছটফটে আর অমনোযোগী। এই বয়েসেই ওর একটা আত্মবিশ্বাস জন্মে গেছে, নিজের মতামত জোর দিয়ে বলতে পারে। সেই তুলনায় পিয়া অনেক নরম, শান্ত।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, ওরা দু'জনের কেউ-ই একবারও আমার পা ভাঙার বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। আমি যে চারদিন আসিনি, কেন যে আসিনি তা ওরা জানে না? মিছেই আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পার হয়ে এলুম বারান্দাটা।

এদের মা-বাবা ফিরে আসবার আগেই যদি উঠে পড়তে পারি। মাসীমা এসে জিজ্ঞেস করবেনই, পা-টা দেখেতে চাইবেন। সারা পৃথিবীতে ওর চেনাশুনো যত লোক আছে সকলের স্বাস্থ্য বিষয়ে উনি চিন্তিত।

—আচ্ছা, মাসশাই মনে করুন, আপনি ওয়ার্ল্ড টীমের ম্যানেজার, আপনাকে বেস্ট ইলেভন ক্রিকেটার সিলেক্ট করতে বলা হয়েছে।

— ওয়ার্ল্ড টীম কার এগেনইনস্টে?

— এগেইনস্ট ইংল্যাণ্ড, অফ কোর্স।

আমি খেলা বিষয়ে পাগল নই, সাধারণ একটু-আধটু খবর রাখি এই মাত্র। বাবুজীর মুখস্থ বিশ্বের সব খেলোয়াড়ের নাম। অঙ্ক কষার এক ফাঁকে সে রোজ একবার করে খেলার প্রসঙ্গ তুলবেই। তবে আমি কায়দাটা এখন শিখে গেছি, দু'একটা কথা বলে খুঁচিয়ে দিলেই বাবুজী তারপর নিজেই সব কিছু বলবে।

— যারা এখন খেলছে, তাদের নিয়ে টীম তো?

— না না, অল টাইম গ্রেট।

— তাহলে প্রথমেই ক্যাপটেন ঠিক করতে হয়।

— হ্যাঁ, বলুন।

— সোবার্স।

— সোবার্স?

— নিশ্চয়ই।

— আপনি ব্র্যাডম্যানের কথা ভুলে যাচ্ছেন, মাসশাই? দিস ইজ প্রিপস্টারাস।

— আমার ব্র্যাডম্যানের চেয়ে সোবার্সেকেই বেশি পছন্দ।

— হি ইজ মিডিওকার, মাসশাই, হি ইজ মিডিওকার।

— মোটেই না, যেমন ব্যাটিং তেমনি বোলিং, আর খেলার মধ্যে কোনো টেনশান নেই, খুব সহজভাবে এসে রান তুলবে।

— য়ু আর ফরগেটিং ডব্লু সি গ্রেস।

— না, না, মনে আছে। তুব আমি চাই সোবার্সক। নেভার লেটস ইউ ডাউন, পটাপট ক্যাচ ধরবে। বোলিং করতে এসেও মারাত্মক বল করবে।

পিয়া অনুযোগের গলায় বললো, না মাস্টারমশাই, সোবার্স নয়, নীল হার্ভে। কী সুন্দর ওকে দেখতে।

কোথায় ব্র্যাডম্যান-গ্রেস-সোবার্স আর কোথায় নীল হার্ভে। পিয়ার কাছে সৌন্দর্যই শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা।

বাবুজী বকুনি দিয়ে বললো, তুই থাম তো দিদি। হোয়াট ডু য়ু নো অ্যাবাউট ক্রিকেট। নীল হার্ভে হেঃ।

পিয়া তার দীঘল চক্ষু দুটি ছোট ভাইয়ের ওপর স্থাপন করে বললো, বাবুজী তুমি আমার সঙ্গে ওরকম মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলবে না। বিহেভ ইয়োরসেলফ।

বাবুজী তাতে একটুও না দমে গিয়ে বললো, হাঃ। বিহেভ ইয়োরসেলফ। আমি কী বলছি ? আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইয়াং গার্লস লাইক য়ু অ্যাণ্ড লেইডিজ লাইক মা টু মেড্‌ল ইন ক্রিকেট। দে স্পয়েল দা হোল অ্যাটমসফিয়ার। তাই না মাসশাই ?

এই বয়েসেই বাবুজী পাকা মেল শভিনিস্ট। সে মেয়েদের জগৎ আর ছেলেদের জগৎটা আলাদা রাখতে চায় এখনো। প্রেমে পড়ার বয়েস হয়নি তো।

পিয়া বললো, ফের ওরকম ভাবে কথা বলছো ? আমি মাকে বলে দেবো কিন্তু।

— মাকে বলে দেবো। আ রিয়েল সিসি।

এইবার আমাকে বাধা দিতে হয়! হাত উঁচু করে বলি, এই আর না, আর না। খেলার কথা থাক, এবার পড়াশুনো।

আমার মূল কাজ ওদের মাঝখানে দু'ঘন্টা বসে থাকা যাতে ওরা বইতে মন দেয়। সর্বক্ষণ ঝগড়া না করে। একটু মন দিলে পড়াশুনোর ব্যাপারটা ওরা নিজেরাই ঠিকঠাক করে নিতে পারে।

দেয়াল ঘড়িতে টং করে সাড়ে আটটা বাজতেই উঠে পড়লুম। এখনো মাসীমা এসে পড়েননি। বাড়ি থেকে বেরিয়েই ঝড়ের বেগে চলে এলুম পেট্রোল পাম্পের সামনে। বাড়ি ফিরতে এখনো এক ঘন্টা লাগবে। নিউ আলিপুর থেকে বাসে এস্‌প্লানেড, সেখান থেকে ট্রাম। আমর ট্রামের মান্থলি টিকিট আছে।

বাস আসবার আগেই বৃষ্টি এসে গেল হুড়মুড়িয়ে।

পিয়া বাবুজির মায়ের নাম সুনেত্রা। এমন সুন্দরী আমি এ পর্যন্ত আর একজনও দেখিনি। পুরুষদের মাথার চুল কোকড়া হলে আমার বিচ্ছিরি লাগে, কিন্তু মেয়েদের চুল অল্প ঢেউ খেলানো হলে খুব সুন্দর দেখায়। ওর ঠোঁট আর চিবুকের কাছটা ঠিক বতিচেল্লির আঁকা একটা ছবির মতন হুবহু। অত বড় বড় দুটি ছেলেমেয়ে ওঁর, কিন্তু ওঁকে দেখলে কিছুতেই ছাব্বিশ–সাতাশের বেশি মনে হয়। না বন্ধুবান্ধবরা যখনই কেউ কোনো সুন্দরী মেয়ের প্রসঙ্গ তোলে, তক্ষুণি আমি মনে মনে ভাবি, আমার ছাত্র–ছাত্রীর মা সুনেত্রা দেবীর চেয়েও–সুন্দর ? হতেই পারে না।

বাইরে নিশ্চয়ই ওকে অন্যরকম দেখায়, কিন্তু বাড়ির মধ্যে উনি খুবই মা–মা ধরনের। সর্বক্ষণ ছেলেমেয়েদের জন্য উদ্বিগ্ন। সুন্দরী রমণীসুলভ লাস্যের বদলে ওঁর চরিত্রে স্নেহের ভাবটাই প্রবল। আমাকেও উনি মনে করেন যেন বাচ্চা ছেলে। আরেঃ, একুশ বছর বয়েস হয়ে গেছে। এতদিনে বিয়ে করলে পাঁচটা ছেলে মেয়ের বাবা হয়ে যেতুম।

এই রকম এক রাত্রে খুব বৃষ্টি, সুনেত্রা দেবী আমাকে জোর করে একটা ছাতা দেবেনই। আমি কিছুতেই নেবো না। কিন্তু উনিও ছাড়বেন না। কলেজ থেকে বেরিয়ে প্রায় ঘন্টা দু'য়েক ধরে প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে এক কোমর জল ভেঙে কলেজ স্ট্রীট থেকে শ্যামবাজার গেছি, এই তো সেদিন। পরশু দিনও আশু ভাস্করদের সঙ্গে দেশবন্ধু পার্কে

আড্ডা দিতে দিতে খুব ভিজলুম। আর এখান থেকে পেট্রোল পাম্পের বাস স্টপ পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে চলে যেতে পারবো না ?

সুনেত্রা দেবী জোর করে তবু একটা ছাতা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন, আর সেই রাত্রেই আমি হারিয়ে ফেললুম ছাতাটা। বাস থেকে নেমে ট্রামে উঠেছি, ওয়েলিংটনের কাছে এসে মনে পড়লো, আরে, ছাতাটা কোথায় গেল ? ফেলে এসেছি বাসে। অভ্যেস নেই তো আর কি সেই বাস পাওয়া যায় ?

লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবার মতন অবস্থা। পরের ছাতা কেউ হারায় ? ওরা যদি ভাবেন, আমি ইচ্ছে করে ছাতাটা ফেরত দিচ্ছি না। একটা নতুন ছাতা কিনে দেবারও উপায় নেই। ঠিক ধরে ফেলবেন। আমি জানি তো সুনেত্রা দেবীর স্বভাব। বকাবকি করবেন খুব। আর ঐ রকম ছাতা পাবেই বা কোথায়। বাঁটের ওপর দিকটা হলদেটে–সাদা। প্লাস্টিক না হাতির দাঁত তাই বা কে জানে ?

তখন ঠিক করেছিলুম আর যাবোই না ও বাড়িতে। সে মাসের পনোরো দিন পড়িয়েছি, সে মাইনেও নিতে যাবো না, কিন্তু সেটাও সম্ভবপর ছিল না, আমার এক কলেজের বন্ধুর মাসীমা হন ঐ সুনেত্রা দেবী, সেই বন্ধুটিই আমায় যোগাড় করে দিয়েছে এই টিউশানি। সেই সূত্রে আমিও ওঁকে মাসীমা বলি। আমি হঠাৎ ডুব মারলে উনি নিশ্চয়ই আমার সেই বন্ধুটিকে পাঠাতেন আমাদের বাড়িতে।

আবার গেলুম বটে কিন্তু লজ্জায় ছাতাটার কথা বলতেই পারলুম না উনিও জিজ্ঞেস করলেন না কিছু। তারপর এক মাস কেটে যেতে আমার আড়ষ্ট ভাবটাও অনেকটা কেটে গেল, ওঁরা নিশ্চয়ই ছাতার কথাটা ভুলে গেছেন। ওঁরা এত বড়লোক কী একটা সামান্য ছাতার কথা মনে রাখবেন ?

আবার একদিন ঐ রকম বৃষ্টি নামতেই সুনেত্রা দেবী আর একটি ছাতা এনে আমায় বলেছিলেন, এই নিন, একদম ভিজবেন না, এখন সময়টা ভালো নয়।

আমার মুখটা যে ব্লটিং পেপারের মতো হয়ে গিয়েছিল, সেই মুহূর্তেই তা আমি আয়নায় না দেখলেও বলতে পারি।

শুকনো গলায় আমতা আমতা করে বলেছিলুম, মাসীমা ইয়ে আপনি আমায় আগে যে ছাতাটা দিয়েছিলেন সেটা আমি হারিয়ে ফেলেছি—

এক লক্ষ টাকা দামের একটা হাসি হাসলেন সুনেত্রা দেবী। সেই হাসিতে দুষ্টুমি আর প্রশ্রয় মেলানো।

— সে আমি জানি, সে ছাতা আপনি সেই দিনই হারিয়ে ফেলেছেন।

আপনি জানেন ? তবু আপনি আমায় আজ আবার ছাতা দিচ্ছেন ?

— ওমা, আমরা ছাতা হারাই না ? আমার ছোটভাই মন্টু, যে এখন শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে আছে, সে তো মাসে দুটো করে ছাতা হারাতো!

— আমি শুধু শুধু কবার আপনাদের ছাতা হারাবো ?

— দেখি কবার হারাতে পারেন ? আমরা বিনা পয়সায় অনেক ছাতা পাই।

— যাঃ!

হ্যাঁ, সত্যি! মহেন্দ্র দত্তর বাড়ির এক ছেলে আপনার মেসো-মশাইয়ের যে খুব বন্ধু। প্রত্যেক মাসে অনেকগুলো ছাতা পাঠিয়ে দেয় আমাদের।

আবার সেই রকম হাসি। জানি, উনি শেষের কথাটা সম্পূর্ণ বানিয়ে বললেন, আবার জোর করে একটা ছাতা গুঁজে দিলেন আমার হাতে।

সে ছাতাটা আমি হারাইনি অবশ্য, খুলিওনি একবারও, একখানা তরোয়ালের মতন সব সময় শক্ত করে ধরেছিলাম হাতে। আজ উনি থাকলে নিশ্চয়ই আবার ছাতা গছাতেন।

একটা বাস এসে পড়তেই আমি গাড়িবারান্দার তলা থেকে দৌড়ে এসে উঠে পড়লুম।

বাসটা বেশ ফাঁকা। জানলার ধারে সীট পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। বৃষ্টির ছাঁট এলেও আমি জানলা বন্ধ করা পছন্দ করি না।

আরাম করে বসতে না বসতেই কণ্ডাকটর এসে বললো, টিকিট।

অন্যমনস্কভাবে পকেট থেকে আধুলিটা বার করে দিলুম।

কণ্ডাকটর সেটি ভালো করে পরীক্ষা করে বললো, এই যে ভাই, আমরা মল্লিক বাজারের জিনিস নিই না।

মল্লিক বাজার ? আমি চমকে উঠে তাকালুম। তার মানে কী ? কণ্ডাকটর বললো, আমায় কী রাতকানা পেয়েছেন যে শীসের জিনিস চিনতে পারবো না?

আধুলিটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলুম। তাই তো, রংটা যেন কেমন কেমন! হাতে ঘষে দেখলুম দাগ পড়ে যাচ্ছে। যাঃ।

এ পকেট ও পকেট খোঁজার ভান করলুম। যদিও নিজের কোষাগারের হিসেব আমি আগেই জানি ? ছাত্রছাত্রীদের পাড়িয়ে রাত্রে সোজা বাড়ি ফিরবো, আট আনা পয়সাই তো যথেষ্ট। তাছাড়া আমি কি লাট সাহেবের নাতি যে প্রয়োজনের বেশি টাকা-পয়সা আমার পকেটে ঝনঝন করবে!

—ইয়ে, আমার কাছে যে আর কোনো খুচরো পয়সা নেই।

—খুচরো নেই ? আর বুঝি সবই একশো টাকার নোটন ?

কণ্ডাকটরটির বিদ্রূপের সুর আমার গায়ে বিঁধে গেল। তাতে আমি উত্তেজিত হয়ে আর এতটা বোকার মতন কাজ করে ফেললুম। পকেট থেকে মান্থলিটা বার করে বললুম, বিশ্বাস করুন, আমার কাছে ট্রামের মান্থলি আছে।

—ও! ভুল করে ট্রাম ভেবে বাসে উঠে পড়েছেন ? ভেবেছেন এটা হাওড়ার মতন এক বগিওয়ালা ট্রাম ? হে হে হে!

বেশ জোরে ছুটছিল বাসটা। ঘটাং করে ঘন্টা বাজিয়ে দড়িটা ধরে রেখে কণ্ডাকটর আমার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। অর্থাৎ আমাকে এই মুহূর্তে নেমে যেতে হবে।

বাসের অন্য যাত্রীরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে আমায় ? ওরা কি ভাবছে, আমি চোর কিংবা পকেটমার ? বে-পাড়ার লোফার ?

দুপাশে বন্দুকের নলের মাঝখান দিয়ে গ্যারি কুপার যে-রকম ক্যাজুয়ালি হেঁটে যায়, ঠিক সেইরকম দু'পকেটে হাত দিয়ে আমি এগোলুম দরজার দিকে। শুধু শেষ মুহূর্তে পেছন ফিরে গুড়ুম গুড়ুমটা বাকি রইলো। আর একদিন হবে!

নেমে পড়লুম আলতোভাবে।

এ যে মাত্র দীপ্তি সিনেমা! এসপ্লানেড অনেক দূর। বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণ নেই। বেশি রাত করার কোনো মানে হয় না। পরের বাসটি আসতেই উঠে পড়লুম বিনা দ্বিধায়।

এই বাসটিতে বসবার সুযোগটুকু পেলাম না পর্যন্ত। ঠিক যেকটা সীট, সেই কটা লোক বসে আছে, একমাত্র আমাকেই শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কণ্ডাকটর একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন, ঘুম ঘুম চোখ, টিকিটের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ আছে বলে তো মনে হয় না। আমি যথাসম্ভব দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

ঠিক পরের স্টপেই একজন লোক নামলো একেবারে দরজার পাশের সীটটা থেকে। আর কেউ উঠেলো না। অর্থাৎ ঐ খানে আমাকে বসতে হয়। সীট খালি থাকলেও দাঁড়িয়ে থাকা বিসদৃশ দেখায়। কিন্তু ঐ জায়গাটা যে একেবারে বাঘের মুখে।

বসতেই হলো। এবার নিজে থেকেই ভালোমানুষ সেজে বললুম, দেখুন, আমার কাছে একটা আধুলি আছে দেখুন তো এটায় কোনো গোলমাল আছে নাকি ? কেউ ছিয়ে দিয়েছে—

আধুলিটা হাতে নেওয়া মাত্র কণ্ডাকটর বাবুটি বললেন, এঃ আপনাকে তো খুব ঠকিয়ে দিয়েছে। একদম ভূষিমাল।

— খুব মুশকিল হলো—

নিন্, এটা চালানো অসম্ভব!

— কিন্তু আমার কাছে যে আর পয়সা নেই— ভুলে মানিব্যাগ বাড়িতে ফেলে এসেছি।

— কিন্তু স্টেট বাস তো আমার বাপের সম্পত্তি নয়।

— ঠিক আছে, নেমে যাচ্ছি!

— এবার বৃষ্টি বাঁচিয়ে একটা গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়ালুম। আমার ভাগ্যেই কি বারবার এই রকম হয়! রাত্তিরবেলা বাড়ি ফেরার সময় এই রকম ঝামেলা কারুর ভালো লাগে ? এই আধুলিটা তো আমি বাড়িতে বানাইনি, আমায় এটা কেউ গছিয়ে দিয়েছে, আমার কাছে তো এটার দাম আট আনাই।

এটা কে দিয়েছে আমি জানি। গতকাল কফি হাউস থেকে নামবার সময় এক টাকার নোট ভাঙিয়ে ইসমাইলের কাছ থেকে একটা ক্যাপস্টান কিনেছিলুম। সেই খুচরোতেই চলছে। কাল ধরতে হবে ইসমাইলকে। কিন্তু এখন ?

এখন আমি ইচ্ছে করলে বাস বদলে বদলে এসপ্ল্যানেডে চলে যেতে পারি। মারবে তো না, বড় জোর বাস থেকে নামিয়ে দেবে। কিন্তু আচমকা আমার খুব অভিমান হয়ে গেল। গলার কাছে বাষ্প। কেন রাত সাড়ে নটায় বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি থেকে এত দূরে আমার পকেটে শুধু একটা বাজে আধুলি ? কেন কেন কেন ? আমায় যারা চেনে, যে-সব বাড়িতে আমি যাই, তারা কি কেউ কল্পনা করতে পারবে যে ভাড়া দিতে পারি না বলে বাস থেকে আমাকে নামিয়ে দেয়।

গোঁয়ারের মতন হাঁটতে লাগলুম মাঝ রাস্তা দিয়ে। জামা-প্যান্ট এরই মধ্যে ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে গেছে। সাউথের চেয়ে নর্থ ক্যালকাটায় বেশি জল জমে। হয়তো গিয়ে দেখবো ওদিক এত জল জমেছে যে এসপ্লানেড থেকে ট্রাম চলছে না। আমি মনে মনে

বললুম, তাই হোক, যত ইচ্ছে জল জমুক। ট্রাম বন্ধ হয়ে যাক্ আমি হেঁটেই যাবো। সব রাস্তা। দরকার হলে আমি সারা রাত হাঁটতে পারি।

।। তিন ।।

আমার সপ্তাহের প্রতিটি দিন সমান ভাগ করা।

সকালে পাড়ার কাছেই একটা টিউশানি আর সন্ধ্যেবেলা নিউ আলিপুরে। আর সপ্তাহে তিন দিন একটি কলেজের ছাত্রকে পড়াতে হয়। ভবানীপুরে রাত সাড়ে আটটার পর। দুটো টিউশানির টাকা মায়ের হাতে তুলে দিই, ভবানীপুরের টিউশানির কথাটা বাড়িতে চেপে গেছি, ওটা আমার হাত খরচ।

আমার দুপুরবেলা একদম ফাঁকা।

অথচ দুপুরবেলায় রাণীর সঙ্গে দেখা করার কোনো উপায় নেই। ভরদুপুরে কি কেউ কারুর বাড়িতে যায় ? যদিও রাণী এখন প্রত্যেক দিন দুপুরে বাড়িতে থাকে, দেড় মাস বাদেই ওর বি. এস-সি পরীক্ষা।

মাঝখানে ভেবেছিলুম, রোজ দুপুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশুনো করে পণ্ডিত হবো। কয়েকদিন পর আর মন টিকলো না। ক্ষুধার্তের কাছে যেমন গোলাপ ফুলের কোনো মূল্য নেই, সেইরকম বেকারেরও ভালো লাগে না। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস কিংবা আধুনিক সমাজতত্ত্ব। ন্যাশনাল লাইব্রেরির চুপচাপ আবহাওয়াটা আমার বেশ পছন্দ, কিন্তু শুধু সেখানে গিয়ে বসে থাকার জন্য তো রোজ বাস ভাড়া খরচ করা যায় না।

বাবা প্রায়ই শ্লেষের সঙ্গে বলেন, কতবার বলেছিলুম, আর্টস পড়িস না। সায়েন্স নে! তখন তো শোনা হলো না আমার কথা!

বাবার ধারণা, সায়েন্স পড়লেই আমি এতদিনে চাকরি পেয়ে যেতুম! তাও তো পুরোপুরি আর্টস নিতে দেননি বাবা, বি. এ-তে তাঁর ইচ্ছে মতন অনার্স নিলুম ইক্‌নমিক্‌স। কিছুদিন পরেই দেখলুম, ওরে বাবা ইক্‌নমিক্‌সেও যে অঙ্ক আছে। শুধু তাই নয়, ছুঁচেলো ধরনের আঙ্কিক মাথা না হলে ইক্‌নমিক্‌স ভালো করে বোঝাই যায় না। সুতরাং রেজাল্ট বিশেষ সুবিধের হলো না।

সবাই যদি বিজ্ঞান কিংবা ইক্‌নমিক্‌সই নেবে, তা হলে ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন এসব পড়বে কারা ? এসব আস্তে আস্তে মুছে যাবে পৃথিবী থেকে ? নাকি এখন থেকে শুধু আগমার্কা থার্ড ডিভিশান পাওয়া ছেলে-মেয়েরাই পড়বে ঐ সব সারজেক্ট ? হায় সক্রেটিস, হায় টয়েনবী, হায় শেক্‌সপীয়ার!

আমার বন্ধুরা প্রায় সবাই দুপুরে বিভিন্ন অফিসে আবদ্ধ হয়ে গেছে। কফি হাউসেও এখন এসে গেছে অন্য নতুন ব্যাচ। তবু মাঝে মাঝে যেতে হয় কফি হাউসেই। নইলে কি মাসী-পিসীদের মতন দুপুরে বাড়িতে পড়ে পড়ে ঘুমোবো ?

ইচ্ছে করেই অনেকটা পথ ঘুরে রাণীদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যাই কফি হাউসের দিকে। রাণীদের বাড়ির ডান দিকের একতলায় ঘরের একটা জানালা খোলা। জানি ঐ ঘরে বসে বসে পড়ছে রাণী। খোলা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো, দেওয়ালের সঙ্গে

লাগানো টেবিল, রাণীও বসে দেয়ালের দিকে মুখ করে, মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে মুখ মোছা ওর স্বভাব।

রাণীদের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ। ও বাড়িতে অনেক লোক, এখন দরজায় ধাক্কা দিলেই অন্য কেউ না কেউ শুনে ফেলবে ? সকাল বা সন্ধ্যেবেলা আমি অনায়াসে ঐ বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াতে পারি। রাণীর দাদা সুরঞ্জন আমার বন্ধু, দূর থেকে লক্ষ্য রাখতে হয়, সুরঞ্জন কোনদিন সকাল বা সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থেকে বেরোয়। তার একটু পরেই গিয়ে আমি নিরীহ মুখ করে বলতে পারি, সুরঞ্জন আছে ? নেই ? ইস্, ওর সঙ্গে যে আমার খুব দরকার ছিল। আচ্ছা ওর ছোটবোনকে একবার ডেকে দাও তো, একটা কথা বলে দিতে হবে সুরঞ্জনকে।

এক একদিন দুপুরে খুব ইচ্ছে করে একতলায় ঘরটার ডান দিকের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে রাণীকে শুধু একবার দেখে আসি। কথাটা ভাবলেই টিপটিপ করে বুকের মধ্যে। আমি জানলার কাছে গিয়ে ডাকবো রাণী! ও চমকে পেছন ফিরে তাকাবে— । না, তা হয় না, ওপর থেকে কেউ দেখে ফেলতে পারে। দ্রুত পা চালিয়ে চলে যাই।

কফি হাউসে চেনা একজনও নেই যে আমার কফি খাওয়াতে পারে। অন্যান্য টেবিলে সেকেণ্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ারের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা টেবিল ফাটাচ্ছে, ঠিক যেমন দু-তিন বছর আগে আমরা আসর জমাতুম।

ইসমাইল আধুলিটা ফেরত নিতে রাজী হলো না কিছুতেই। আজ আমার সঙ্গে দলবল কেউ নেই তো, একা দেখেছে তাই পাত্তা দিচ্ছে না। অতএব ধারেই দুটো সিগারেট নিতে হলো। তারপর পুরোনো বইয়ের দোকানগুলোতে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি। বেশিক্ষণ ধরে কোনো বই পড়লে তাড়া দেয়। তবে পাতিরামের স্টলের লোকেরা আমায় চেনে। ওখানে দাঁড়িয়ে অন্য পত্র-পত্রিকার ধারাবাহিক উপন্যাস আমি পড়ে নিতে পারি।

একটা পুরোনো বইয়ের দোকানে একটা বই খুব পছন্দ হয়ে গেল কিন্তু মেরে দেবার উপায় নেই, এদের চোখ খুব কড়া। আমার পাশে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে হ্যারল্ড ল্যাস্কির গ্রামার অফ পলিটিকস বইটা কিনলো। বার টাকা দিয়ে। বাঃ, বেশ ভালো দাম উঠেছে তো। আমার বাড়িতে একখানা গ্রামার অফ পলিটিকস পড়ে আছে, কালই এনে ঝেড়ে দিতে হবে।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে একজন প্রৌঢ় বেশ দামী সুট পরা, কিন্তু মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, কাশলেন দু'বার, শরীর বেশ খারাপ মনে হয়। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে লোকটির চেহারায় বেশ একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে।

লোকটি তাকালেন আমার দিকে—আমার দৃষ্টির সঙ্গে মিলে গেল—ঠিক যেন চুম্বকের মতন একটা দৃষ্টির সেতু—

—প্রৌঢ় লোকটি হাতছানি দিয়ে ডাকলেন আমাকে। আমি কিছু না বুঝে যেতেই বললেন, খুব বেশি সময় নেই সংক্ষেপে সেরে নিতে হবে···· বেশি প্রশ্ন করো না···তুমি এক্ষুণি আমার সঙ্গে যেতে পারবে এক জায়গায়।

আমি অবাক। উনি আমার নাম জানেন না, তুমি বলে কথা বলছেন, আবার যেতে বলেছেন ওঁর সঙ্গে····কে উনি ?

— মানে···আপনাকে তো আমি····

— বললুম না বেশি সময় নেই····যেতে পারবে কি–না বলো।

— কোথায় ?

সেটা তো গেলেই বুঝতে পারবে···তুমি যদি রাজী না থাকো।

— হ্যাঁ যেতে পারি, আমার হাতে তো কোনো কাজ নেই।

— ঐ যে আমার গাড়ি এসে গেছে!

একটা কালো রঙের রোভার এসে থামলো আমাদের ঠিক সামনে! একেবারে ঝকঝকে তকতকে। সামনে খাকি পোশাক ও সাদা টুপি পরা শ্যোফার। সে দ্রুত নেমে এসে সসম্ভ্রমে পেছনের দরজা খুলে দাঁড়ালো।

প্রৌঢ় আমাকে বললেন, তুমি ওঠো আগে — ।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই তিনি কোটের ভেতরের পকেট থেকে বার করলেন একটা সোনার সিগারেট কেস। সেটা খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, খাও ?

সিগারেটগুলো বোধ হয় ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ। লোভ হচ্ছিল, কিন্তু এরকম বয়স্ক লোকের সামনে কোনোদিন সিগারেট খাইনি! ঘাড় বেঁকিয়ে বললুম, না।

— বাঃ! অভ্যেস করো নি যখন, তখন আর ধরো না! বাজে জিনিস।

নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, অমন আড়ষ্ট হয়ে আছো কেন ? ঠিক করে বসো। তোমার নাম কী ?

নাম বললুম।

— চাকরি করো কিছু ?

— আজ্ঞে এখনো পাইনি।

— বাড়ির বড় ছেলে ?

— না! ছোটো।

— ঠিক আছে শোনো, ওঃ····

হঠাৎ ভদ্রলোক দারুণ কাশতে লাগলেন, চেপে ধরলেন বুকটা, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আমি খুব অসহায় বোধ করলুম। শ্যোফার একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বাড়ি ফিরে যাবো স্যার ?

প্রৌঢ় লোকটি একটা হাত নেড়ে না বোঝালেন। তারপর কাশি একটু কমলে পেছনে হেলান দিয়ে শুয়ে রইলেন চোখ বুজে।

গাড়ি শ্যামবাজার ছাড়িয়ে ছুটতে লাগল বি টি রোড ধরে। কোথায় যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি কিছুই বোঝবার উপায় নেই। একটা সিগারেট টানবার জন্য মনটা উসখুস করছে।

চোখ বোজা অবস্থাতেই ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবা মা তোমায় কী নামে ডাকেন ?

— নীল।

— আমিও যদি সেই নামে তোমায় ডাকি, তোমার আপত্তি আছে ?

— না না আপত্তি করবো কেন ?

—আমার কোটের ডান পকেটে হাত দিয়ে দেখো তো, একটা ওষুধের ফাইল আছে কি–না—

এরকম অবস্থায় কোনোদিন পড়িনি। একজন অচেনা লোক বলছেন তাঁর পকেটে হাত দিতে। কিন্তু ভদ্রলোক অসুস্থ যখন····

ঝুঁকে ওঁর কোটের ডান পকেটে হাত দিয়ে সত্যিই একটা ওষুধের ফাইল পেলাম।

—ওর থেকে একটা ট্যাবলেট আমার মুখে দিয়ে দাও তো!

—ইয়ে—জলটল কিছু লাগবে না ?

—না, শুধু ট্যাবলেটটা দিলেই হবে। তাপর ফাইলটা আবার পকেটে রেখে দাও।

তাই দিলুম। ভদ্রলোক এবার যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আমার আর কোনো গত্যন্তর নেই।

অনেকক্ষণ বাদে গাড়িটা এসে থামলো একটা লোহার গেটের সামনে। দু'জন নেপালী দারোয়ান সেখানে বসে ছিল, তারা গেটটা খুলে দিয়ে কপালে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। গাড়িটা ঢুকে এলো ভেতরে।

অনেকখানি বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে এক দিকে একটা কারখানার মতন শেড, আর একদিকে একটা দোতলা বাড়ি, সবই একেবারে নতুন। ছোট ছোট নারকেল গাছ লাগানো হয়েছে কম্পাউণ্ডের দেওয়ালের ধার ঘেঁষে।

শোফার গাড়ির দরজা খুলে দিতেই ভদ্রলোক চোখ মেলে বললেন, এসে গেছি ? এসো নীলু— । তুমি এখনো আমার নাম জানো না। আমার নাম পি. এন. রয়, তুমি আমার নাম শুনেছো আগে ?

আমি ইতস্তত করতে লাগলুম। ইনি খুব বিখ্যাত লোক ? আমার আগেই নাম জানা উচিত ? কিন্তু আগে কখনো শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না — ,

—তুমি ছেলেমানুষ, হয়তো নাও জানতে পারো। অনেকে জানে। অনেকে আমায় শুধু স্যার পি. এন. বলে ডাকে।

—আপনি এখন সুস্থ বোধ করছেন একটু ?

—হ্যাঁ, একটু, ও ঠিক আছে চলো —

আস্তে আস্তে তিনি এগিয়ে গেলেন কারখানার শেডটার দিকে। সেখানেও একজন দারোয়ান রয়েছে, পি. এন. ইঙ্গিত করতেই সে দরজার তালা খুলে দিল।

ভেতরে সার সার মেশিনপত্র সাজানো। সবই একেবারে ঝকঝকে নতুন। দেয়ালে এবং আসবাবপত্রে নতুন রঙের গন্ধ।

একটা বড় মেশিনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, এই আমার স্বপ্ন। আমার কবিতা। এই সব মেশিনের ডিজাইন আমি নিজে করেছি, ভারতবর্ষে প্রথম। এক পয়সা ফরেন এক্সচেঞ্জ খরচ হয়নি। আগামী মাসের পয়লা তারিখ থেকে এই ফ্যাক্টরি চালু হবার কথা····।

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি অদ্ভুত ফ্যাকাসে ভাবে হাসলেন। আমার চোখের দিকে সোজা চেয়ে আছেন, পলক পড়ছে না।

—হ্যাঁ চালু হবার কথা ছিল···সমস্ত টেকনিশিয়ান আর ওয়ার্কারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়ে গেছে··আর আজ আমি ডাক্তারের কাছ থেকে বায়োপসি রিপোর্ট পেলুম। আমার লাংক্যানসার হয়েছে, আমার আয়ু আর বড় জোর ছ' মাস। তাও যদি চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকি—

এমন নাটকীয় ট্রাজিক ঘটনা শুনে আমার স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কী ? স্যার পি. এন. সোনার কেস থেকে আর একটা সিগারেট বার করলেন। লাং-ক্যানসার, তাও উনি সিগারেট খাচ্ছেন ?

যেন আমার মনের কথাটাই বুঝতে পেরে উনি বললেন, এখন আর কিছু যায় আসে না, সিগারেট খাই বা না খাই। এ দেশের সবচেয়ে বড় স্পেশালিস্ট আমার মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিয়েছে। যদি আমি আর ছ' মাসের বেশি না বাঁচি, তা হলে এতসব গড়লুম কেন ? কে চালাবে ? আমার তো আর কেউ নেই!

এবার আমার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি মারলো। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের গতি হয়ে গেল দ্বিগুণ! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো ? গোপনে নিজের গালে একটা চিমটি কাটলুম। না, স্বপ্ন নয় তো, বেশ ব্যথা লাগছে!

—শোন, নীলু, কাল থেকেই নার্সিং হোমে যেতে হবে আমাকে। তোমাকে ভার নিতে হবে এই কারখানার।

—আমি ?

—হ্যাঁ, তুমি এটা চালাবে। পারবে না ?

—আমি—মানে আমি তো কারখানা সম্বন্ধে কিছু বুঝি না, আমার সায়েন্সের তেমন জ্ঞান নেই।

—সে তো টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার থাকবেই, তার জন্য কোনো চিন্তা নেই—আমি চাই ডাইনামিক পার্সোনালিটি আছে এমন একজন মানুষ, ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়েই খুঁজছিলুম সেইরকম একজনকে যে নিতে পারবে আমার জায়গা। তোমাকে দেখেই চমকে উঠেছি—তোমার মুখে আছে সেই ছাপ, তুমি পারবে, আমি জানি তুমি ঠিক পারবে—

এই সময় কেউ আমার গায়ে একটা ফুল ছুঁড়ে মারলেও বোধ হয় আমি মূর্ছা যেতাম। এ সব কি সত্যিই আমি শুনছি! নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। এত বড় একটা কারখানা, নতুন, এর পরিচালক হবো আমি!

—শোনো, আমি কালই কাগজপত্রে লেখাপড়া করে দিতে চাই, তুমি আপাতত হবে এর একান্ন পার্শেন্টের মালিক, যতদিন আমি বেঁচে আছি— তারপর—সে ব্যবস্থা আমি পরে করে যাবো।

—না, না,স্যার পি. এন. শুনুন।

—ঐ যে নতুন দোতলা বাড়িটা, ঐখানে তুমি থাকবে। বাড়ির পেছনে বাগান আর সুইমিং পুল আছে, যে-গাড়িটা চেপে এলে সেটাই তুমি রেখে দিও তোমার ব্যবহারের জন্য।

—স্যার পি. এন. আপনি ভুল লোককে বেছেছেন। আমি এ কাজের অযোগ্য।

—না নীলু , তোমার কোনো আপত্তি আমি শুনবো না। তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছি তুমি পারবে। তা ছাড়া আর একটা কথা বলবো, তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। আমার ছেলে—আমার একমাত্র ছেলে আমার ওপর রাগ করে চলে যায়, আজ থেকে এগারো বছর আগে। সারা দেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কোনো চেষ্টার বাকি রাখি নি। পয়সা খরচ করেছি জলের মতন— সে বোধ হয় আর বেঁচে নেই— । তোমায় দেখে চমকে উঠেছিলাম কেন জানো, অবিকল তোমার মতন মুখের আদল ছিল তার, একেবারে যেন যমজ। আরও আশ্চর্য দেখো তার নামও ছিল নীলাঞ্জন। না, না নীলু তুমি কিছুতেই আপত্তি করতে পারবে না। এই মুমূর্ষু বৃদ্ধের অনুরোধ তুমি রাখবে না ? বলো ? এই কারখানা আমার এতদিনকার স্বপ্ন হয়ে যাবে ? নীলু, তোমাকে এটা চালাতেই হবে —আমার কাছে এসো, আমার গা ছুঁয়ে শপথ করো যে—

টং করে একটা শব্দ হলো। বাস স্টপের প্রৌঢ় লোকটি কোটের পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার করে গুণছিলেন, তার মধ্য থেকে একটা সিকি মাটিতে পড়ে গড়িয়ে এলো আমার দিকে।

আমি একই সঙ্গে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললুম ও মুচকি হাসলুম। তারপর সিকিটা কুড়িয়ে তুলে দিলুম প্রৌঢ়টির হাতে, তিনি শুকনো গলায় বললেন, ধন্যবাদ। তারপর হাত তুলে ডাকলেন এই রিকসো, রিকসো।

একটা রিকশা এসে দাঁড়াতেই তিনি উঠে পড়ে বললেন, চলো মানিকতলা। অনেকক্ষণ বাস-ট্রাম আসছে না বলেই বোধ হয় তিনি গুণছিলেন রিকশা ভাড়া।

এর পর ইসমাইলের কাছ থেকে একটা সিগারেট ধার না করলে চলে না। এক কাপ কফিও খেতে হবে যে-কোনো উপায়ে। আবার ফিরে চললুম কফি হাউসের দিকে।

।। চার ।।

যখন নিজে ছাত্র ছিলুম তখন সকালে ঘুম ভাঙতে চাইতো না কিছুতেই। বাবা-দু-তিনবার তাড়া দিয়ে যেতেন। এখন ঠিক সাড়ে ছটায় ঘুম ভেঙে যায়। কোনোরকমে চোখ- মুখ ধুয়েই ধাঁ করে চলে যাই বাজার করতে। ঐ ভারটা আমার ওপর। ওটা করতে আমার ভালোই লাগে, কিছু খুচরো রোজগার হয়! ফিরে এসে এক কাপ চা খেয়েই আবার বেরুনো। সকালের প্রথম টিউশানি।

উত্তর কলকাতায় গত শতাব্দীর যে কয়েকটি বনেদী বাড়ি এখনো টিকে আছে তার মধ্যে একটি। রাস্তার দিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে সবটা ঘেরা, মাঝখানে লোহার গেট। গেটের পাশেই দারোয়ানের ঘর। ভেতরে অযত্নে ফেলে রাখা বিরাট বাগান, তার শেষ দিকটায় অর্কিড হাউস, পাম ও দেবদারু গাছের সারি। এখানে এলে মনেই হয় না এটা কলকাতা শহরের মধ্যে। যে শহরে দশ বাই বারো সাইজের ঘরে এক পরিবারের পাঁচ-ছজন মানুষ গাদাগাদি করে থাকে। এদের এই বাগানে রয়েছে দু তিনটি জলের ফোয়ারা, কোনোটা দিয়েই এখন জল বেরোয় না এবং এখানে-ওখানে পাঁচ-ছটি শ্বেতপাথরের নগ্ন নারীমূর্তি। স্কুল জীবনে এই বাড়িটার পাশ দিয়ে যাবার সময় লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে ঐ মূর্তিগুলি এক ঝলক দেখে আমরা শরীর গরম করে নিতুম।

বাড়িটি বোধ হয় তিনমহলা। বিভিন্ন শরিকের আলাদা আলাদা অংশ। গেট দিয়ে ঢুকে অনেকখানি যেতে হয় আমায়। একটা চাঁপা গাছে সারা বছরই ফুল ফোটে। সেটার তলায় দাঁড়িয়ে বুক ভরে একবার গন্ধ নিই। তারপর এগিয়ে যাই দরজার দিকে।

প্রত্যেকদিন অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করতে হয়। ভেতরে উঁকি মারলে দেখা যায় বারান্দার পর বারান্দা, উঠোনের পর উঠোন, যেন, এক গোলকধাঁধা। বেশি দূর যাবার এক্তিয়ার নেই আমার। প্রথম বারান্দাটায় এসে আমি ডাকি বাব্‌লু।

আমার এ ডাক আমার ছাত্র শুনতে পাবে না। সে থাকে অনেক দূরে। কিন্তু সেই ডাক শুনে কোনো একজন ভৃত্য আসে। সে দু-তিনখানা উঠোন পেরিয়ে গিয়ে হাঁক দেয়। খো-কা-বা-বু! তোমার ম্যাস্টার এ-য়ে-চে!

দু-তিনবার এই রকম ডাকের পর ওপর থেকে উত্তর আসে, যা-ই। বসতে বলো।

এ বাড়িতে যে কত ঘর অব্যবহৃত পড়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই মনে হয়। গত শতাব্দীতে জাঁক দেখাবার জন্য এই সব বড় বড় বাড়ি তৈরি হতো, এখন প্রত্যেকদিন এই গোড়া বাড়ি ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার রাখাই বিরাট খরচের ব্যাপার।

একটা বড় হলঘরের পাশে একটি ছোট্ট ছিমছাম ঘরে আমায় বসতে দেওয়া হয়। ছাত্রটির নিজস্ব পড়বার ঘর ওপরে, কিন্তু অতখানি অন্দরমহলে বাইরের লোকের যাওয়ার নিয়ম নেই।

এই ঘরটির ঠিক সামনেই রয়েছে চমৎকার একটি ভাস্কর্য। কোনো বিলিতি শিল্পীর কাজ। একটি অনিন্দ্যকান্তি কুমারী কন্যার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মিনতি করছে পাদ্রীর পোশাক-পরা একজন প্রৌঢ়। মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। শ্বেতপাথরের এই শিল্পের মধ্যে যে কোন কাহিনী লুকিয়ে রয়েছে তা আমি জানি না। ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি প্রত্যেকদিন ঐ মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকি আর এক একদিন এক রকম গল্প ভাবি।

এই সব বাড়ির ছেলেমেয়েরা খুব অল্প বয়েস থেকেই নানা রকম পশ্চিমী ভাস্কর্য ও ছবি দেখে বলে ছবি বা পাথরের নগ্ন নারী সম্পর্কে খুব একটা শিহরণ নেই। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো এখনো মধ্য-ভিক্টোরিয়া যুগে পড়ে আছে। আমাদের মতন বাড়ির গুরুজনেরা এরকম একটি মূর্তি সাজিয়ে রাখার কথা কল্পনাই করতে পারেন না। অথচ কী সুন্দর!

এক সময় আমি এ বাড়িতে পড়াতে আসতুম সন্ধ্যেবেলা। সে সময় এ বারান্দাটা অন্ধকার থাকে। আমাকেই এসে আলো জ্বালতে হতো পড়ার ঘরের। এক নির্জন সন্ধ্যায় মনে হয়েছিল গোটা নিচ তলাটাতেই কেউ নেই। আমি পড়ার ঘর পর্যন্ত এসে, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে চট করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলুম এই মূর্তিটার সামনে। যেন পাদ্রীটিকে সরিয়ে দিয়ে আমি নিজেই সেই নগ্ন কুমারীর কাছে প্রার্থনা করছি। পাদ্রীটি কোনো বাধা দিল না। আমি সেই সরলা, স্বর্গ কন্যার মতন শ্বেতপাথরের বালাটির ওষ্ঠ চুম্বন করলুম, সেই আমার প্রথম চুম্বনের অভিজ্ঞতা।

আমার ছাত্রটির খুব হাসিখুশী, ফুটফুটে চেহারা। সাহেবদের মতন গায়ের রং। খুব ছোট বয়েস থেকে পড়াচ্ছি বলে ও আমায় একটুও ভয় পায় না। মাত্র এগারো বছর বয়েস,

ছোট্টখাট্টো জমিদার সেজে হেলতে-দুলতে ঘরে ঢুকেই বলে মাস্‌মোশাই, আপনি চারদিন আসেন নি কেন?

— বাঃ, তোমার বাবাকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলুম?

— ওসব আমি জানি না। আপনি আসেন নি কেন আগে বলুন।

— আমার কাজ ছিল।

— ওসব কাজ-ফাজের কথা আমি শুনবো না। আপনাকে রোজ আসতে হবে। না হলে আমি আর পড়বো না কিন্তু, এই বলে দিচ্ছি।

পাকা জমিদারের রক্ত একেই বলে। আমার দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে থাকে বাব্‌লু। আমি হাসতে হাসতে বললুম, আচ্ছা আচ্ছা আজ অনেকখানি বলবো।

নিছক পড়ার আগ্রহেই বাব্‌লু রোজ আমার দর্শন চায় না। প্রত্যেক দিন পড়ানো শেষ করার পর ওকে একটা গল্প বলতে হয়। অত গল্প কোথায় পাবো আমি? তাই এখন শুরু করেছি ধারাবাহিক উপন্যাস, সম্রাট আলেকজাণ্ডার সেই উপন্যাসের নায়ক। ইতিহাসে লিখতে ভুলে গেছে এমন সব রোমহর্ষক অভিযানের কাহিনী আমি আলেকজাণ্ডারের নামে চালিয়ে দিই, প্রত্যেকদিন একটা করে যুদ্ধ না থাকলে বাব্‌লুর পছন্দ হয় না। আলেকজাণ্ডারকে দিয়ে আমি এক ড্রাগনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়েছি পর্যন্ত।

এক এক দিন আচমকা আমাকে গল্প পাল্টাতে হয়। গল্প শুরু করার মুহূর্তেই বাব্‌লু বলে, একটু দাঁড়ান মাস্‌মোশাই, আমি আসছি, তারপর ছুটে বেরিয়ে যায়। একটু পরে ফিরে বলে, দিদিও গল্প শুনবে।

বাব্‌লুর দিদির নাম মালবিকা, আপন দিদি নয়, একজন কাকার মেয়ে। তেরো-চৌদ্দ বছর বয়েস হবে। এই মালবিকাকেও আমি এক সময় পড়িয়েছিলুম কিছুদিনের জন্য। তারপর মালবিকা ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে বিলেত চলে যায়। বছর চারেক সেখানে কাটিয়ে সদ্য ফিরেছে। মালবিকার খুব সূক্ষ্ম ধরনের চেহারা। ভুরু দুটি যেন চীনা শিল্পীর টান, খুব পাতলা ঠোঁট, তার মুখখানি এবং গায়ের রং যেন স্বচ্ছ। ভারি আশ্চর্য মেয়ে মালবিকা, এই বয়সেই বেশ গম্ভীর। আর এতদিন বিলেতে থেকে এলো তবু একটিও ইংরিজি শব্দ উচ্চারণ করে না। যখন তখন প্রবাসের গল্প শুরু করে না। কখনো কোনো ঘটনার উল্লেখ যদি বা করে, বিলেতে বলে না, বলে ওদেশে কিংবা সাহেবদের দেশে।

মালবিকার সামনে আজগুবি গল্প বলতে আমার সাহস হয় না, বিলেতের স্কুলে চার বছর পড়েছে, নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে। সুতরাং আমাকে সত্যিকারের ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ের কথা ভাবতে হয়।

বাব্‌লু যেমন চঞ্চল, মালবিকা তেমনি নম্র আর শান্ত। এক মন দিয়ে শোনে, গল্পের করুণ জায়গায় ওর চোখ ছলছল করে। কিন্তু মালবিকার মাথাতেও দুষ্টবুদ্ধি কম নেই।

গল্প শেষ করে আমি যখন উঠছি, তখন মালবিকা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মাস্টোমশাই একটা জিনিস বলুন তো? একদিন খুব ঝড়-বৃষ্টির রাতে আফ্রিকার একটা জিরাফ তার বন্ধু একটা হাতিকে কানে কানে কী বলেছিল?

আমি চোখ কুঁচকে রইলুম। এ আবার কী ধাঁধা!

বাব্‌লু হাততালি দিয়ে বললো, আমি জানি! আমি জানি!

মালবিকা বললো, এই তুই চুপ কর! মাষ্টোমশাই, আপনি বলুন।

— কোন ঝড়-বৃষ্টির রাতে?

—সে মনে করুন যে-কোনো একদিন খুব ঝড়-বৃষ্টি···· জিরাফটা কী বলেছিল হাতিকে ?

—আমি তা কী করে জানবো ? তুমিই বা জানবে কী করে ?

—হ্যাঁ, আমি জানি। কিছুই বলে নি! কারণ জিরাফরা মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ করতেই পারে না। সব জিরাফই বোবা।

বাবলু হো-হো করে হেসে একেবারে গড়াগড়ি যায় আর কি!

মাস্টারমশাইয়ের চেয়ে তার দিদি যে কোনো বিষয়ে বেশি জানে, এতেই সে খুব আমোদ পেয়েছে।

মালবিকা কিন্তু অত জোরে হাসে না। ঠোঁটে পাতলা হাসি এঁকে আমার দিকে চেয়ে থাকে। প্রত্যেকবার এরকম সব নতুন নতুন ধাঁধা ও বার করতেও পারে মাথা থেকে!

— যে গল্পটা একটু আগে বললেন সেটা যে-বইতে আছে সে বইটা আমার চাই। কাল এনে দেবেন।

আমার প্রতি এই হুকুম জানিয়ে মহারাণীর ভঙ্গিতে মালবিকা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

যে-হলঘরটির পাশের বারান্দা দিয়ে আমায় হেঁটে আসতে হয়, সেই হলঘরটিতে আমি মাত্র একদিন ঢোকার সুযোগ পেয়েছি। সেখানে অন্তত পঁচিশ-তিরিশটি সোফা-কৌচ সাজানো। সবগুলোতেই ঢাকনা দেওয়া। কতদিন সেইসব ঢাকনা খোলা হয়নি কে জানে! দেয়ালে অন্তত তিরিশ-বত্রিশটা ঘড়ি, তার মধ্যে কোনোটাতে কোকিল ডাকে ; কোনোটায় এক কামার প্রতি মিনিটে একবার করে কুড়ুলের ঘা মারে, কোনোটায় গীর্জার ঘন্টার মতন আওয়াজ হয়। দেয়ালের ওপরের দিকে আছে সব বিলিতি অয়েল পেইন্টিং, বেশির ভাগই নগ্ন নারীর এবং কিছু কিছু ইওরোপীয় নিসর্গ। কয়েকটি ছবির বিষয়বস্তু যেন আমি চিনতে পেরেছিলুম। একটা তো নিশ্চয়ই রাজা কফেটুয়া আর সেই লাল চুলের ভিখারিণী কন্যা।

সেই হলঘরে সকাল সাড়ে আটটায় প্রতিদিন এসে বসেন এক বৃদ্ধ। মাথায় টাক কিন্তু নাকের নিচে বিরাট পাকানো গোঁফ। কোনোদিন তাঁকে গেঞ্জি শার্ট বা পাঞ্জাবি পরতে দেখিনি, তাঁর গায়ে থাকে সিল্কের বেনিয়ান, যার বোতাম বুকের বাঁ পাশে। এই বৃদ্ধ যেন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছেন। ইনি বাবলু-মালবিকার দাদু।

ইনি এই হলঘরে বসামাত্র একজন ভৃত্য একটি রুপোর গড়গড়া রেখে যায় ওঁর পাশে। উনি নলটা তুলে চোখ বুজে টানেন। খানিক বাদেই হাজির হয় একজন সিঁড়িঙ্গে চেহারার লোক, সে বসে মেঝেতে কার্পেটের ওপর ঐ বৃদ্ধের পায়ের কাছে। এই সিঁড়িঙ্গে চেহারার লোকটির মাথায় টিকি, গায়ে চাদর জড়ানো। সেখানে বসেই লোকটি কী যেন চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করে। প্রথম বুঝতে পারিনি লোকটা কী পড়ে।

আমি যে ঘরে বসে পড়াই সেখানকার একটা জানলা দিয়ে ঐ হলঘরটার খানিকটা অংশ দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকবার উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখে ব্যাপারটা বুঝেছি। ঐ

সুঁটকো লোকটি একজন মাইনে করা পাঠক। প্রথমে সে বাংলা খবরের কাগজের বিশেষ বিশেষ খবরগুলো বাড়ির মালিককে পড়ে শোনায়। তারপর পাঠ করে গীতার কিছু অংশ।

বাব্‌লু-মালবিকার দাদু চোখ বুজে তামাক টানতে টানতে শুনে যান, মাঝে মাঝে দুটি একটি মন্তব্য করেন, তাঁর গলার আওয়াজ গমগমে, পরিষ্কার শুনতে পাই পড়ার ঘর থেকে।

এক একদিন তিনি আচমকা হুংকার দিয়ে ওঠেন, চামড়া খুলে নেবো গায়ে নুন ছিটিয়ে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো! ব্যাটা বেল্লিক!

আমি থ! এসব কাকে বলা হচ্ছে, ঐ বেচারি আমসত্ত্ব মার্কা বামুন পাঠকটিকে ? কী অন্যায় করেছে সে ?

বাব্‌লু পড়া থামিয়ে হেসে বলে দাদু, ক্ষেপেচে!

আমার অনুমতি না নিয়েই ছুটে বেরিয়ে যায় সে। তখন ওদিকে চলতে থাকে সেই হুংকার আর দাপাদাপি। জানলা দিয়ে উঁকি মারতেও আমার সাহস হয় না।

বাব্‌লু ফিরে এলে চুপি চুপি জিজ্ঞস করি কী হয়েছিল ?

—ঘড়ি বেঁকে গেছে!

—তার মানে ?

—প্রসন্ন ঘড়িতে চাবি দেয়, কিচ্ছু পারে না।

প্রসন্ন এ বাড়ির গোমস্তার ছেলে। তার ওপরে ভার নির্দিষ্ট দিনে ঐ ঘড়িগুলো চাবি দেওয়া। সেই দেওয়ালের কোনো ঘড়ি সে এক চুল বাঁকিয়ে ফেললেই ঐ বৃদ্ধ চোখ বোজা অবস্থাতেও কোনো অলৌকিক উপায়ে তা টের পেয়ে যান।

এ রকম তর্জন-গর্জন প্রায়ই শুনতে পাই। নিয়মিত গীতা-পাঠ শুনেও ঐ বৃদ্ধের মনে কোনো প্রশান্তি আসে নি বোঝা যায়।

একদিনই মাত্র আমার সঙ্গে সেই বৃদ্ধের কথা হয়েছিল। আমি পড়িয়ে ফিরছি মাথা নিচু করে, তিনি সেই রকম বাজখাঁই গলায় হাঁক দিলেন, এই যে ওহে মাস্টার শোনো—।

আমায় যে ডাকছেন প্রথমটায় বুঝতেই পারি নি। তখনও চোখ বুজে আছেন, হাতে গড়গড়ার নল।

—তুমিই তো খোকার মাস্টার ? এদিকে এসো। তুমি কটা পাস দিয়েছো ?

কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। কটা পাস দিয়েছি মানে ?

চুপ মেরে দাঁড়িয়ে আছো কেন ? কথা কানে যায় নি।

—আজ্ঞে ?

—বলি, বি. এ. পাস হয়েছে ?

—ও হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ !

—তবে ঠিক আছে যাও! আমি শুনলুম খোকাকে কে একজন অল্পবয়িসী মাস্টার পড়াচ্ছে অন্তত বি. এ. পাস যদি না হয়—

বাড়িতে ফিরে বাবার কাছে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলুম পুরোনো লোকেরা এখনো বি. এ. পাসকে তিনটে পাস মনে করেন। আমরা বলি পাস করা, ওঁরা বলেন পাস দেওয়া!

—মাসমোশাই, মঘুবাঈ এসেছেন আপনি, যাবেন তো ?

— মঘুবাঈ ? কে মঘুবাঈ ?

— মঘুবাঈ কুরদিকার, পাথরেঘাঁটায় আমার মামার বাড়িতে আসছেন!

— ও হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাবো!

— কাল সন্ধ্যেবেলা। আপনি নিজে যেতে পারবেন ? বাবা বলেছেন, আমাদের গাড়িতেও আপনি যেতে পারেন।

— না, আমি নিজেই যাবো।

এগারো বছরের ছেলে বাব্‌লু মঘুবাঈ কুরদিকার নামে বিখ্যাত মার্গ সঙ্গীত–গায়িকার নাম জানে, তাঁর গান শুনতে যায়। পাথুরিয়া–ঘাটার বিখ্যাত ঘোষদের সঙ্গে বাব্‌লুদের আত্মীয়তা আছে, সে বাড়িতে সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক–গায়িকারা আসেন। আমি এর আগেও দু–একবার গেছি। টিকিট–ফিকিটের ব্যাপার নেই, শুধু নির্বাচিত নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে গান করেন গুলাম আলী কিংবা হীরাবাঈ কিংবা কেশরাখাঈ। সেখানে যেতে গেলে আমাকে ধুতি পরতে হয়, প্রথমবার প্যান্ট পরে কী লজ্জাতেই পড়েছিলুম। অন্য সবাই পরেছেন কুচোনো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর। আসর বসে একতলার ঠাকুর দালানে, সেখানে একজনও মহিলা নেই, তারা সবাই দোতলার চিকের আড়ালে। যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর এক পাতা ছবি। একমাত্র আমিই প্যান্ট–শার্ট পরা বলে সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল, যেন আমি একটা চাকর–বাকর।

বাব্‌লুকে নিয়ে আমাকে একবার দারা সিং–এর কুস্তিও দেখতে যেতে হয়েছিল। বাব্‌লুকে বাবা অনুরোধ করেছিলেন। রোববার সন্ধ্যেবেলা দেশবন্ধু পার্কে আমার বন্ধুবান্ধবদের বিরাট আড্ডা। সেখানে না গিয়ে আমায় দেখতে হলো ময়দানের তাঁবুর মধ্যে বসে পুরুষ মানুষদের শরীরের চটকাচটকি। কুস্তি ব্যাপারটা আমার কাছে বীভৎস আর অশ্লীল লাগে।

অন্য কারুর সঙ্গে না পাঠিয়ে আমাকেই যে যেতে হয় বাব্‌লুর সঙ্গে তার বিশেষ একটা কারণ আছে। কুস্তি তো আর একলা দারা সিং লড়ে না, তার সঙ্গে আছে রনধাওয়া, বিষেণকুমার, কিং কং, মুখোশপরা ফ্যানটম, সুপারম্যান ইত্যাদি। দেখতে দেখতে বাব্‌লুর মনে যত রকম প্রশ্ন জাগবে, তার উত্তর তো মাস্টারমশাইকেই দিতে হবে। এটাও শিক্ষার অঙ্গ। সেইজন্য নানান খবরের কাগজ পড়ে আমাকে ঐসব কুস্তিগীরদের জীবনী জেনে রাখতে হয়। এইভাবে বাব্‌লুকে নিয়ে আমি সার্কাস দেখতে এমন কি হর্টিকালচারল গার্ডেন, বোটানিক্যাল গার্ডেনও গেছি। কারণ ঐ একই!

অ্যারিস্টোক্র্যাসির এই একটা দিক আমার চোখে পড়ে। বেলা থেকেই গান–বাজনা থেকে শুরু করে সব দিকে আগ্রহ তৈরি করে দেবার চেষ্টা। এগারো বছর বয়সেই বাব্‌লুর গলায় ফুটে ওঠে আত্মবিশ্বাসের সুর!

বাব্‌লুকে দেখে আমার এক এক সময় মনে পড়ে সুশীলের কথা। সুশীল আমার প্রথম ছাত্র।

তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। বাবার ঘাড়ে হলো বিরাট কার্বঙ্কল, মায়েরও কী যেন একটা কঠিন অসুখ। বাবা আর মা দু'জনেই শয্যাশায়ী, মাসের পর মাস। আমাদের বাড়িতে তখন কোনো রাঁধুনী ছিল না, দাদা আর আমি পালা করে রাঁধতুম। সেই ক্লাস

মাইনেই আমার বেগুন ভাজা রান্নার খুব সুনাম হয়েছিল। বেগুন ভাজা মোটেই সহজ নয়, কড়াইতে তেল ফুটবার সময় ওপরের সব ফেনা মিলিয়ে গেলে তারপর বেগুন ছাড়তে হয়।

অসুখে ভুগে ভুগে বাবা খুব রোগা হয়ে গিয়েছিলেন, কিছু লিখতে গেলে হাত কাঁপে, সেই অবস্থাতেই একটা বেয়ারার চেক লিখে আবার পাঠিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে। আমাকে চেকটা ফেরত দিয়ে দিল ব্যাঙ্কের লোকেরা। সই মিলেছিল, কিন্তু একশো টাকার চেক, বাবার অ্যাকাউন্টে আছে মাত্র একানব্বই টাকা। সে কথা বাড়ি ফিরে দাদাকে জানালুম। দাদা বাথরুমে বসে থুপ্ থুপ্ করে জামা-কাপড় কাচছিল, ঘাড় ফিরিয়ে বললো, আজ থেকে মাছ খাওয়া একদম বন্ধ। আমি এ মাস থেকে দুটো টিউশানি নিয়েছি, সব ম্যানেজ হয়ে যাবে। উনুন ধরে গেছে তুই চট্ করে ভাতটা চাপিয়ে দে তো!

সেই দিনই ভেবেছিলুম আমাকেও কিছু রোজগার করতে হবে। দারোয়ানের কাছ থেকে গঁদ চেয়ে নিয়ে স্কুলের বাইরের দেয়ালে আর রাস্তার কয়েকটা জায়গায় সেঁটে দিলুম আমার নিজের হাতে-লেখা বিজ্ঞাপন। ছাত্র পড়াতেই চাই। ক্লাস ওয়ান হইতে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত ছাত্রদের উত্তমরূপে পড়াইব। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। এক সপ্তাহ অপেক্ষা করেই একটা সুযোগ পেয়ে গেলুম।

শ্রী-উত্তরা সিনেমার পেছন দিকের বস্তিতে সুশীলদের বাড়ি। সুশীলের বাবা হাতিবাগান বাজারের সামনের ফুটপাথে বসে গেঞ্জি আর রুমাল, মোজা বিক্রি করেন। তিনিই দেখা করেছিলেন আমার সঙ্গে। আমার এত কম বয়েস তিনি আশা করেন নি, প্রথমে নিরাশ হলেও চাকরিটা দিয়ে দিলেন আমার পদবী শুনে। ব্রাহ্মণ বলে কথা। কে বলে কলি যুগে ব্রহ্মতেজ নেই!

মাইনে কুড়ি টাকা। দু' বেলা পড়াতে হবে এক ঘন্টা করে। সুশীলের বাবা আমার সামনে হাত-জোড় করে বলেছিলেন, দেখুন মাষ্টারবাবু, আমি ফেরিওয়ালা, আমার জীবনটা তো এইভাবেই কাটবে। ছেলের জন্য যত পয়সা খরচা করতে হয় রাজি আছি আমি। তবু যাতে ছেলেটা লেখাপড়া শিখে একটা চাকরি-বাকরি পেয়ে ভদ্রলোক হয়! আপনাদের মতন ভদ্দরলোকের বাড়ির ছেলেরা গড়গড়িয়ে সব পরীক্ষায় পাস করে যায়, আমাদের বাড়ির ছেলেরা পারে না কেন ? আমিও তো ওকে বই-খাতাপত্তর যখন যা দরকার সব কিনে দি!

ছেলেটির নাম সুশীল, কিন্তু সে নিজে এবং সবাই বলে সুসিল্! প্রথম দিন থেকেই আমি এটা শোধরাবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু ওদের জিভের আড়ই অন্যরকম। আশ্চর্য ব্যাপার, কলকাতার এক ধরনের লোকের জীবন থেকে তালব্য শ একদম বাদ! এই অক্ষরটাকে কেন যে তারা পছন্দ করে না কে জানে! দন্তের স-এর উচ্চারণও ইংরিজি এস-এর মতন।

সুশীলের বয়স বারো, পড়ে ক্লাস ফাইভে, যদিও পড়া উচিত ছিল ক্লাস টু-তে। ছোট হাতের ইংরিজি অক্ষরই লিখতে পারে না ভালো করে, আট-নয়ের নামতা মুখস্থ নেই। নেতাজী কে ছিলেন জানে না, ১৫ই আগস্ট কেন ছুটি থাকে তাও জানে না। বস্তির মধ্যে প্রায়ই এমন গোলামাল হয় যে পড়ানো খুব মুশকিল। সুশীলের টিউশানি করতে গিয়ে

আমার নিজস্ব একটা লাভ হয়েছে। ওখান থেকে আমি কয়েকটা চমৎকার অশ্লীল গালাগাল শিখেছি।

সন্ধ্যেবেলা হারিকেনের আলোয় পড়তে বসেই সুশীল ঘুমে ঢোলে। নকল ঘুম নয়। সত্যিই সাতটার পর সে আর চোখ মেলে থাকতে পারে না। আর কোনো বারো বছরের ছেলের এমন ঘুম আমি দেখিনি। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সুশীলের, আগের দিন আমি একটা কবিতা ওকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছি, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বই না দেখে বলতে পেরেছে, পরদিন সেটা আবার ভুলে গেছে সম্পূর্ণ। আমি দু-একটা লাইন মনে করিয়ে দিলেও বলতে পারে না।

সারাদিন খেটেখুটে রাত্রে বাড়ি ফিরে সুশীলের বাবা আমায় প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন, কী মাস্টারবাবু কী রকম দেখেছেন ? পারবে ? কেলাস ফাইভে দুবার ফেল করেছে, এবার পাস করবে তো? দেখুন বই-খাতা সব কিনে দিয়েছি, মাস্টার রেখেছি, আমি ওর মাকে বলে দিয়েছি, আধ-পেটা খেয়ে থাকবো তবু ছেলের পড়াশুনোয় যাতে কোনো ক্ষতি না হয়····। মাস্টারবাবু, আপনার পড়ানো হয়ে গেলে আমার একটা উপকার করবেন ? যদি আমার হিসেবটা একটু লিখে দেন— ।

রোজই সুশীলের বাবার কেনা-বেচার হিসেব আমি লিখে নিতাম একটা খেরো খাতায়। বিভিন্ন সাইজের গেঞ্জির গ্রোসের কোনটার কত দাম তা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

ঠিক নভেম্বর মাসে আমি সুশীলের টিউশানিটা ছেড়ে দিই। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় কিন্তু সুশীলকে পাস করানো অসম্ভব। কিংবা স্কুল থেকে ওকে এবার অ্যালাউ করে দেবে, যেভাবে ক্লাস টু থেকে ও ফাইভে উঠেছে, সেইভাবেই সিক্সে উঠবে।

সুশীলের বাবা খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। আমি কাঁচুমাচুভাবে বলেছিলুম, দেখুন আমার বাবা খুব আপত্তি করছেন আমার নিজের পড়াশুনোর যদি ক্ষতি হয়···· শেষে যদি আমি নিজেই ফেল্ করে যাই—

—ও আপনি ঠিক পাস করবেন, আমি জানি!

—আমার তো এবার ক্লাস টেন হবে, ফাইন্যাল ইয়ার বেশি পড়াশুনোর চাপ।

—আপনার জীবনে উন্নতি হোক, ভালো হোক! আমাদের মতন গরীব ঘরের ছেলের কি লেখাপড়া হয় ?

—ও নিজে চেষ্টা করলে ঠিকই পারবে।

ধুৎ! ধুৎ! এ বস্তির একটা ছেলেও লেখাপড়া করে না, যদি বা কেউ ইস্কুলে যায় বড় জোর ঐ কেলাস ফাইভ পর্যন্ত····।

ক্লাস নাইনে আমাদের বাংলা র‍্যাপিড রিডারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটা জীবনী ছিল। সুশীলের বাবাকে শুনিয়ে দিলুম সেটা। কত দারিদ্র্যের মধ্যে, কত অসুবিধে, বাড়িতে বসে পড়াশুনোর জায়গাই ছিল না, তবু তিনি বিদ্যাসাগর হয়েছেন।

—এই যেনার কথা বললেন তিনি কী জাত ?

—বিদ্যাসাগর ? ওঁর পদবী বোধ হয় ভট্টাচার্য কিংবা বন্দ্যোপাধ্যায়···ঠিক মনে পড়ছে না।

—ঐ তো বামুন। তা তো হবেই। বামুনের রক্তের মধ্যে লেখাপড়া থাকে, ওদের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয় ? তবু আপনার সঙ্গে রোজ দুটো কথা বলে ছেলেটার একটু অন্তত উপকার তো হচ্ছিল—।

সেই সুশীলকে এখনো দেখতে পাই আমি। ঢ্যাঙা, চোয়াড়ে চেহারা হয়েছে, হাতে লোহার বালা পড়ে, শ্রী—উত্তরা সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করা ওর পেশা! আমায় দেখলে খাতির করে, জিভ কেটে বলে, না, না, আপনার ঠেঙ্গে বেশি পয়সা লেবো না মাস্‌টার মোসাই!

।। পাঁচ ।।

সুরঞ্জনের সঙ্গে রূপবাণী সিনেমার সামনে হঠাৎ দেখা। অর্থাৎ সুরঞ্জন ভাবলো হঠাৎ আমরা মুখোমুখি এসে পড়লুম, আসলে সুরঞ্জনকে আমি পাশের রেলওয়ের সিটি বুকিং অফিসে ঢুকতে দেখে আমিও রূপবাণীর ছবিগুলো দেখছিলুম।

চল নীলু, মধুপুর যাবি আমাদের সঙ্গে ?

— তোরা যাচ্ছিস ? কবে ?

—এই তো খুকুর পরীক্ষাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে একুশ তারিখ, আমরা তেইশ তারিখেই বেরিয়ে পড়বো। ওখান থেকে ঘুরে আসবো শিমুলতলা, ঝাঁঝা···যাবি তো বল্ এক্ষুণি তোর টিকিটটা কেটে নিই।

রাণীর ডাক নাম খুকু। যদি ওদের সঙ্গে মধুপুর যাই তা হলে সব সময় রাণীর সঙ্গে দেখা হবে। এরকম সুযোগের কথা ভাবা যায় ? সকাল–দুপুর–সন্ধ্যে, যখন ইচ্ছে রাণীকে দেখবো, রাণী আমার সঙ্গে কথা বলবে····।

কিন্তু আমার মনের মধ্যে কেউ যেন বলে দিতে লাগলো, এটা হয় না। এভাবে যেতে নেই, এতে রাণীর চোখে তুমি ছোট হয়ে যাবে নীলু। সুরঞ্জন তোমার ট্রেনের ভাড়া দেবে, ওখানে যতদিন থাকবে তোমাকে পয়সা খরচ করতে দেবে না, তাতে কি তোমার সম্মান থাকবে ? তা ছাড়া ইচ্ছা করলেই বা তুমি পয়সা খরচ করবে কী করে? নীলু, মাসের শেষে তোমার পকেটে কি দশটা টাকাও থাকে? রাণীর সেনাপতি–মার্কা চেহারার কাকাটা তোমায় পছন্দ করেন না, তিনি ভাববেন এই হ্যাংলা ছেলেটা আবার কেন আমাদের সঙ্গে এলো?

সুরঞ্জন বেশ লম্বা, স্কুলে পড়ার সময় সব রকম স্পোর্টসে প্রাইজ পেতো, চমৎকার শিস দিয়ে গান করতে পারে, মাথার লম্বা লম্বা চুলের মধ্যে বারবার আঙ্গুল চালানো ওর ম্যানারিজম।

— না রে, ঐ সময় আমার একটা চাকরির ইন্টারভিউ আছে।

— চাকরির ইন্টারভিউ ? কোন্ অফিসে।

— একটা বিলিতি অফিসে, অফিসার ট্রেইনীং।

— কোন্ অফিসে বল্ না।

— জি কে ডব্লু।

—আরে ওখানে তো আমার সেজ্ জামাইবাবু আছেন খুব বড় পোস্টে! তাঁকে বলে দেবো। কবে ডেট্ ? তুই সব আমায় লিখে দে, সীরিয়াসলি সেজ্ জামাইবাবুকে ধরলে তোর চাকরিটা হয়ে যেতে পারে— ।

দুর ছাই। রাস্তার উল্টোদিকের একটা ল্যাম্পপোস্টে জি কে ডব্লু কোম্পানীর একটা হের্ডিং দেখে ঐ নামটা বলে দিয়েছি। আমি কি চাকরির জন্য দরখাস্ত করি নাকি ? পাঁচ-ছশো ছেলের ভিড়ে মিশে ইন্টারভিউ দিতে যাবো আমি ? প্রতিভাবান লোকেরা কখনো চাকরি করে না।

—ঠিক আছে, তোকে লিখে দেবো এখন। দেরি আছে তো এখনো। তুই কোথায় যাচ্ছিস এখন ?

—বাড়ি। তুই আসবি ? চল না আড্ডা মারা যাবে। আজ আমার ছুটি। আর তুই তো বেকার।

সুরঞ্জন ঠিকই জানে যে ওর ছোট বোনের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে। কিন্তু তাতে ও কোনো বাধারও সৃষ্টি করে না, আবার উৎসাহও দেয় না ? কিছু না বোঝার ভান করে থাকে। এই জন্যই সুরঞ্জনকে এত ভালো লাগে আমার। অত্যন্ত পরিষ্কার ছেলে।

আমার অন্যান্য কয়েকজন বন্ধুকে দেখেছি যে-মেয়ের সঙ্গে তাদের ভাব, সেই মেয়েদের বাড়িতে ওরা চলে যায়, নাম ধরে ডাকে কিংবা টেলিফোন করে। কোনো দ্বিধা-সঙ্কোচ নেই। অথচ আমার যে কেন এত লজ্জা, আমি নিজেই বুঝি না। শুধু রাণীর সঙ্গেই দেখা করবার জন্য আমি কিছুতেই যেতে পারি না ওদের বাড়িতে সব সময় একটা কিছু ছুতো দরকার হয়। দু-একবার টেলিফোন করে দেখেছি, প্রত্যেকবারই অন্য কেউ ধরে আর আমি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিই। রাণী আমাকে বলে তুমি কি আমায় একটা টেলিফোনও করতে পারো না ? কিন্তু আমি যে কিছুতেই অন্য কারুকে বলতে পারি না যে, রাণীকে একটু ডেকে দিন।

সুরঞ্জনের বাড়ি গোয়াবাগানে। পুরোনো আমলের বাড়ি, সামনে দুটো বেশ বড় রক, সেখানে পাড়ার বখাটে ছেলেরা খুব যাচ্ছেতাই রকমের গুলতানি শুরু করেছিল বলে এখন রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এ পাড়ায় নানান গোলমাল হয়, রাত্তিরের দিকে প্রায়ই ছুরি-বোমা চলে। এরই মধ্যে এই বাড়িটির প্রতিটি লোক কী করে এমন ভদ্র, সুন্দর থাকতে পারে সেটাই আশ্চর্য।

অবশ্য সুরঞ্জনের কাকাকে পাড়ার গুণ্ডা মাস্তানরাও যে-কোনো কারণেই হোক ভয় পায়। এ বাড়ির ওপর সেইজন্যই কখনো হামলা হয়নি।

বেলা বারোটা বাজে, এখনো কি রাণী পড়ছে ? সেটাই সম্ভব, কেন না পড়ার ঘরে না গিয়ে সুরঞ্জন আমাকে নিয়ে এলো বাঁ দিকের বৈঠকখানায়।

—তুই একটু বোস নীলু, আমি চট করে একবার ওপর থেকে ঘুরে আসছি। চা খাবি তো ?

—হ্যাঁ।

সুরঞ্জন বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠতেই আমি তাড়াতাড়ি দরজার পাশে এসে এসে চেঁচিয়ে বললুম, আগে এক গেলাস জল পাঠিয়ে দিতে বলিস, সুরঞ্জন।

জল তেষ্টা একটুও পায় নি, এটা শুধু আমার গলার আওয়াজটা শুনিয়ে দেবার জন্য ঐদিকের পড়বার ঘর থেকে ঠিক শোনা যাবে। রাণী বুঝতে পারবে যে আমি এসেছি।

তারপর- টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে প্রতীক্ষা। আমার সারা শরীরে যেন জ্বর। প্রত্যেকটি মুহূর্ত অনন্ত কালের মতন লম্বা। বুকের মধ্যে যেন কেট্‌ল ড্রাম বাজছে। রাণী আসছে না। কেন আসছে না ? রাণী শুনতে পায় নি ? ওপর তলা থেকেও তো আমার গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়ার কথা। রাণী কি পড়াবার ঘরের দরজা বন্ধ করে আছে ?

রাণীর দাদার বন্ধু হিসেবে আমি কি নিজেই একবার দেখে আসতে পারি না রাণীকে ? সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করতে পারি না, পরীক্ষা তো কাল থেকে শুরু কেমন পড়াশুনো হলো ? এটা তো খুব স্বাভাবিক। তবু আমার পা ওঠে না।

রাণী এলো না। তার আগেই ফিরে এলো সুরঞ্জন, ওর হাতে জলের গেলাস। আমার যে অন্যরকম তেষ্টা সেটা তো ওকে বোঝানো যাবে না। ঢক ঢক করে শেষ করতে হলো পুরো গেলাসের জলটা। —শোন্ নীলু, তোকে একটা জিনিস লিখে দিতে হবে।

—কী ?

—আমি বাহাত্তর ঘন্টা অবিরাম সাইকেল চালানোর একটা কমপিটিশান ডাকছি। পোস্টার আর হ্যাণ্ডবিল করতে হবে, তুই বেশ ভাষা দিয়ে লিখে।

—কবে হবে ?

—মধুপুর থেকে ফিরে আসি, তারপর।

ইন্টারভিউটা দিয়ে তুই চলে আয় না মধুপুর।

—হবে না, উপায় নেই। আমার পর পর দুটো ইন্টারভিউ আছে।

—জি কে ডব্লুটা তোর ঠিকই হয়ে যাবে দেখিস। কালই সেজ জামাইবাবুকে টেলিফোন করবো। আর একটা কথা, তুই এসেছিস, খুব ভালো হয়েছে। আমরা বাড়িতে একটা লাইব্রেরী খুলবো ঠিক করেছি।

—লাইব্রেরী?

—হ্যাঁ, আমাদের পাশের ঘরটা খালি আছে। ওখানে একটা লাইব্রেরী হবে না ? আমাদের বাড়িতে দু–তিনশো বই আছে, আর তুই যদি হেল্‌প করিস!

—নিশ্চয়ই করবো। আমি অনেক বই জোগাড় করে দেবো!

—এটা খুকুর প্ল্যান। দাঁড়া, খুকুকে ডাকি। খুকু! খুকু!

কেটল ড্রামের বদলে এবার বিগ ড্রাম বাজছে আমার বুকে। সুরঞ্জন কি ঐ দুম দুম আওয়াজ শুনতে পেয়ে যাবে ?

রাণীর এই আগোছালো রূপটিই দেখতে আমার ভালো লাগে সবচেয়ে বেশি। আঁচড়ায়নি, মুখখানা ঘামে তেল চকচকে, শাড়ীটা অগোছালো থুতনিতে একটু কালির দাগ, হাতে একটা কলম!

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝালো গলায় রাণী বললো, কী, আমায় ডাকছো কেন ?

—শোন, নীলু এসেছে, লাইব্রেরী খোলার প্ল্যানটা তাহলে ঠিক করে নিই এখন ···।

একেবারে তেলে–বেগুনে জ্বলে উঠলো রাণী। ভুরু দুটো কুঁকড়ে বললো, কাল আমার পরীক্ষা, এখন আমি ঐসব কথা নিয়ে সময় নষ্ট করবো ? অদ্ভুত তোমার বুদ্ধি!

রাণী পেছন ফিরতেই সুরঞ্জন বললো, একটু দাঁড়া না, কত পড়বি ? একটানা অতক্ষণ পড়লে মাথার ঠিক থাকে না। জানিস, নীলু কাল সারারাত জেগে পড়েছে, একটুও ঘুমোয়নি—আমরাও তো বাবা পরীক্ষা দিয়েছি···।

—আমার এখন সময় নেই!

শালিক পাখিরা উড়ে যাবার আগে যেমন একটা শব্দ করে যায়, সেই রকমভাবে ঐ কথাটা বলে রাণী অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাণী একবারও আমার চোখের দিকে তাকায়নি। যেন আমায় চেনেই না।

সুরঞ্জন বললো, বাবা বলেছেন, যদি আমরা লাইব্রেরী— খুলি, তাহলে মাসে একশো টাকা চাঁদা দেবেন। আমরা আরও কয়েকজনের কাছ থেকে এরকম ডোনেশান জোগাড় করতে পারি····।

—তা চেষ্টা করা যায়।

—এ পাড়ায় ভালো লাইব্রেরী নেই। পাড়ার ছোঁড়াগুলোকে যদি বই পড়ার অভ্যেস ধরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ওরা বোমাটোমা বোধ হয় কম ছুঁড়বে।

—কেউ আবার লাইব্রেরীতে বোমা না মারে ?

—এ বাড়িতে হামলা করার সাহস কারুর নেই। আশু–উৎপল ভাস্করকেও বললে ওরা ওদের বাড়ির বউপত্তর দেবে না আমাদের লাইব্রেরীতে?

—তা দেবে নিশ্চয়ই ?

—একজন ভালো লাইব্রেরীয়ান দরকার, যে প্রত্যেকদিন ঠিক সময় খুলবে, ঠিক সময় বন্ধ করবে, মেম্বারদের ঠিক মতন ট্যাকল করতে পারবে···এই ভারটা কিন্তু তোকেই নিতে হবে, বুঝলি! তুই এখন বেকার, তোর হাতে সময় আছে!

—না, ভাই, ওটা আমার দ্বারা হবে না। বেকার বলেই আমি বেশি ব্যস্ত।

—যাঃ ! যে–কদিন চাকরি না পাস, সেই কদিন অন্তত তুই চালিয়ে দিবি।

—ইমপসিবল। আমি অন্যান্য হেলপ করতে পারি, কিন্তু রোজ রোজ আসা আমার দ্বারা হবে না।

সুরঞ্জন জানে না যে আমি রোজ সন্ধ্যেবেলা টিউশনি করি। যদি তা নাও করতুম, তবু রাজি হতুম না আমি। লাইব্রেরী খোলার জন্য এ বাড়িতে আমি প্রত্যেকদিন এলে নিশ্চয়ই রাণীর সঙ্গেও প্রত্যেকদিন দেখা হবে। আমি তা চাই না। সত্যিই চাই না।

—চা এলো একটু পরেই। আরও খানিকক্ষণ গেঁজিয়ে আমি উঠে পড়লুম। দরজার কাছ পর্যন্ত এসে হঠাৎ মনে পড়ে গেল কাথাটা।

—সুরঞ্জন, তোর কাছে আমার 'পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে' বইটা আছে না!

—তুই ফেরত নিস নি ?

—নাঃ। কবে নিলুম!

—তবে ওটা থাক, তুই ওটা আমাদের লাইব্রেরীতে ডোনেট করে দে ?

—আচ্ছা দেবো, লাইব্রেরী খুলুক, তখন দেবো। ওটা একজন পড়তে চেয়েছে।

—কে ?

—ইয়ে···আমার এক বন্ধুর মা।

—এখন খুঁজে পাবো কি না····আচ্ছা বোস একটু, আমি ওপর থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি····।

ওপরে গিয়ে সুরঞ্জনের বইটা খুঁজে আনতে অন্তত তিন-চার মিনিট তো সময় লাগবেই। এর মধ্যে আমি একবার চট করে পড়বার ঘরে গিয়ে রাণীর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারি না ?

নিশ্চয়ই পারি। তবু আমার পা যেন পেরেক দিয়ে আঁটা। টেবিলের ওপর থেকে বাসি খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে অকারণে অমূল্য সময় নষ্ট করতে লাগলুম।

রাণীর কাল পরীক্ষা, ভীষণ ব্যস্ত, আমি এ সময় ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলে নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে।

এ সময় আমি পিঁপড়ের পায়ের আওয়াজও শুনতে পেতুম, তাই দরজার কাছে একটা শব্দ হতেই আবার ঘুরে দাঁড়ালুম।

রাণী!

এখনো তার মুখে সেই রাগের ভাব। একেবারে আমার সামনে এসে হাত থেকে খবরের কাগজটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে বললো, কাল আমার পরীক্ষা, তুমি এর মধ্যে একদিনও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসোনি কেন ?

—এই তো এলুম!

—বাজে কথা। দাদা তোমাকে জোর করে ধরে এনেছে।

—জোর করতে হবে কেন ? আমার বুঝি এখানে আসার জন্য সব সময় মন ছটফট করে না ?

—ওসব বাজে কথা। তুমি নিজে একলা আসতে পারো না ? তারপর এসেও এই ঘরে বসে রইলে ? একবার আমার কাছে যেতে পারোনি ? এ রকম করলে পড়াশুনোয় মন বসে? আমি ফেল করলে তুমি খুব খুশী হবে তো ?

—তুমি সারা রাত জেগে পড়ছো কেন ?

একথার উত্তর না দিয়ে রাণী ওর ডান হাতটা বাড়িয়ে বললো, দাও।

আমার কাছে তো তৈরিই থাকে, সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু এরপর রাণী যে কাজটা করলো, সেটা একেবারেই অবিশ্বাস্য!

আমি আমার পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে দিতেই রাণী সেটা বাঁ হাতের তালুতে লুকিয়ে ফেললো ম্যাজিসিয়ানের মতন, তারপর আমার দিকে পেছন ফিরে ওর ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বার করে আনলো ভাঁজ করা ওর চিঠি!

—এই নাই!

এ কি····তুমি····এখন পড়াশুনোয় এত চাপ····তবু তুমি····।

—কাল শেষ রাতে লিখেছি····পড়তে পড়তে মাথা ঝিমঝিম করছিল, তখন তোমার কথা খুব মনে পড়লো····তুমি নিশ্চয়ই ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুচ্ছিলে তখন।

—রাণী, শোনো— ।

এক সেকেণ্ডেরও একশো ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা। রাণীর কাঁধে হাত রাখতেই ও ঘুরে গেল, ঠিক আমার ঠোঁটের সামনে ওর ঠোঁট, আমি রাণীকে বুকের ওপর টেনে এনে ওর ঠোঁটে দিলুম গরম আদর।

— এই, না, না, সব খোলা।

ততক্ষণে আমি ছিটকে দূরে সরে গেছি। চোখ তুলে তাকাতে পারছি না। এক মুহূর্ত আগেও আমি এই কথাটা ভাবিনি, যেন অন্য কেউ আমায় ঠেলে দিয়েছে। আমি লজ্জায় রাণীর ঘরে দেখা করতে যেতে পারি না, আর এখানে জানলা-দরজা সব খোলা, যে কোনো মুহূর্তে কেউ এসে পড়তে পারে····!

রাণীর সারা মুখখানি আরক্ত। এত তেজী মেয়ে, কিন্তু এখন আর কথা বলতে পারছে না।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, তুমি একটা গুণ্ডা, ডাকাত, অসভ্য···· ।

প্লীজ, রাগ করো না, প্লীজ ····।

এরকম করলে আমার পড়াশুনো সব গুলিয়ে যাবে না ?

— আমি চলে যাচ্ছি। তোমার কোথায় সীট পড়েছে ?

— দ্বারভাঙ্গা বিলডিংস-এ, কিন্তু তুমি সেখানে যাবে না বলে দিচ্ছি।

— কেন ?

সেখানে অনেকে থাকবে।

— বাঃ আমি এমনি বেড়াতে বেড়াতে ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারি না ?

— না, অসুবিধে আছে।

— ও, সুবীর যাবে বুঝি ?

— আবার ঐ কথা ? তুমি পরীক্ষার আগে আমার মাথাটা খারাপ করে দিতে চাও ?

— না, রাণী, তুমি পড়ো, আমি চলে যাচ্ছি, তোমার ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে।

চুলোয় যাক ডোরিয়ান গ্রের ছবি! বইটা না নিয়েই আমি বেরিয়ে পড়লুম। এক্ষুণি বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না। অনেকবার ভাঁজ করা রাণীর ছোট্ট চিঠিটা আমার হাতে। পড়বার ব্যবস্তা নেই, যেমন ভাবে রাজা-বাদশারা গোলাপের গন্ধ শুঁকতেন, সেইভাবে আমি মাঝে মাঝে শুঁকতে লাগলুম চিঠিটা। ওতে রাণীর বুকের ঘ্রাণ আছে।

আজ আর স্নানও করবো না। আমার সারা দেহে লেগে আছে রাণীর শরীরের স্পর্শ, তা কি ধুয়ে ফেলা যায় ?

আমার বা রাণীর চিঠির কথা ভারতীয় ডাক বিভাগ কিছুই জানে না। ওরা বুঝি ভাবে, ওদের সাহায্য ছাড়া মানুষকে চিঠি লিখতে পারবে না ? হুঁঃ!

অবশ্য, প্রত্যেকদিনই বাড়ি ফিরে দরজার চিঠির বাক্সটা একবার খোলা আমার অভ্যেস। রাণীর চিঠির জন্য নয়, অন্য কোনো একটা বিশেষ চিঠির জন্য আমার প্রতীক্ষা। আমার নামে তেমন চিঠিপত্র আসে না, কেউ-বা লিখবে কিন্তু একদিন একখানা চওড়া নীল খামে একটি অলৌকিক চিঠি আসবে আমার নামে, সব কিছু বদলে দেবে।

দু'দিন বাদে রাত দশটায় বাড়ি ফিরে দেখি, ডাক বাক্সে সত্যিই আমার নামে একটা চিঠি খুব গম্ভীরভাবে শুয়ে আছে। যেন আমার এত দেরি করে ফেরার জন্য সে খুব বিরক্ত।

নীল খাম নয়, খাকি, লম্বা খাম, বেশ ভারী। বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠলো। এই কি সেই ? 'দুয়ার ভেঙে এসেছে মোর দুঃখ রাতের রাজা !'

ফিরতে দেরি হলে একতলার ঘরে আমার ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে। কারুকে ডাকতে হয় না ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি খুব সাবধানে চিঠিখানা খুলতে লাগলুম····।

—সাদা ধপধপে বণ্ড কাগজের প্যাডে টাইপ করা চিঠি। দু'পাতা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিন–চারবার পড়লুম চিঠিখানা। এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না! তাহলে এতদিন যে চাকরির জন্য হ্যাংলামি করিনি, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখাইনি, চেনাশুনো হোমরা–চোমরা লোকদের ধরাধরি করিনি, তা সার্থক হলো ? জীবনে এই তো চেয়েছিলুম।

চিঠিখানা লিখেছে এক অস্ট্রেলিয়ান জাহাজ কোম্পানী। তারা জানিয়েছে যে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মল্লিকের (ডঃ সুহৃদ মল্লিক আমার বড় মামার বিশেষ বন্ধু, ছেলেবেলায় আমার মামার বাড়িতে অনেকবার দেখেছি, আমায় খুব ভালোবাসতেন, এখন অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন) সুপারিশ অনুযায়ী তারা আমাকে এই চিঠি লিখছে। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড নামে একটা দ্বীপে ঐ জাহাজ কোম্পানীর একজন রেসিডেন্ট ম্যানেজারের পদ খালি আছে। দ্বীপটি অতি নির্জন, কিছু আদিবাসী আছে সেখানে। সেখানে অত্যন্ত দামী পশম পওয়া যায় বলে মাসে একদিন জাহাজ যায়। কোম্পানীর রেসিডেন্ট ম্যানেজারের জন্য একটা টিলার ওপর একটি সুদৃশ্য কাঠের বাড়ি এবং সব রকম সুযোগ–সুবিধের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু একটি কথা কোম্পানী আগেই জানিয়ে দিতে চায়। এর আগে যারাই ওখানে পোষ্টিং নিয়ে গেছে, কেউই এক মাসের বেশি থাকতে পারেনি কোনো অনির্দিষ্ট কারণে। ঐ দ্বীপের আদিবাসীরা অতি শান্ত ধরনের, তাদের ব্যবহার বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু যেসব শ্বেতাঙ্গ ওখানে থাকতে যায়, তারাই স্বপ্ন দেখে ভয় পায়। স্বপ্নই বলতে হবে, কারণ তাদের কারুরই কোনো শারীরিক ক্ষতি হয়নি, কিন্তু প্রতি রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখার পর তারা আর থাকতে পারে না। এইরকম ভাবে আটজন ফিরে এসেছে।

কোম্পানী অনেক অনুসন্ধান করে দেখেছে যে, সেখানে ভয় পাবার মতন কোনো কারণই ঘটে না। ডাক্তারী পরীক্ষাতেও কিছু পাওয়া যায়নি। তবে, কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে এক ধরনের মশার কামড়ে এরকম দুঃস্বপ্ন–রোগ হতে পারে। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে কিছু সাদা রঙের মশার সন্ধান পাওয়া গেছে, তবে সে মশার কামড়ও তেমন ক্ষতিকারক নয়, কারণ শরীরে তার প্রতিক্রিয়া বেশিক্ষণ থাকে না।

এই ঘটনা রটে যাওয়ার ফলে সেখানে অস্ট্রেলিয়া থেকে আর কেউ যেতে চাইছে না অথচ সেখানে কোম্পানীর ওয়্যার হাউস আছে, তা এমনি এমনি ফেলে রাখা যায় না। অধিবাসীদের কাছ থেকেও মালপত্র কেনা–বেচার ক্ষতি হচ্ছে, সেইজন্য কোম্পানী অবিলম্বে একজনকে পাঠাতে চায়। ডঃ মল্লিক কলকাতায় আপনার নাম সুপারিশ করেছেন। ডঃ মল্লিক এই কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেকটরসের অন্যতম। তিনি আপনাকে আলাদা ব্যক্তিগত চিঠি পাঠাচ্ছেন। সব জেনে–শুনে এই কাজ নিতে যদি আপনি রাজি থাকেন, তবে অবিলম্বে আপনার সম্মতি টেলিগ্রামযোগে জানান। আপনাকে বিমানে মেলবোর্নে নিয়ে আসা হবে! বর্তমানে আপনাকে দেওয়া হবে মাসে পাঁচশো পাউণ্ড, এক বছর পর টিকে

থাকলে এই বেতন দ্বিগুণ হয়ে যাবে। বছরে দু'বার কোম্পানীর খরচে আপনি দেশে বেড়াতে আসতে পারবেন।

পুনশ্চঃ নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের আদিবাসীদের মধ্যে কিছু লোক পিজিন ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। আপনার পক্ষে এই ভাষা, শিক্ষা বাধ্যতামূলক। অবশ্য, এক ম্যাসের মধ্যেই এই ভাষা শিখে নেওয়া যেতে পারে।

চিঠিটা পড়ে আমি নিথর হয়ে বসে রইলুম। আমি কিছু চাইবো না। কেউ নিজে থেকেই আমায় ডাকবে, এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। সেই ডাক এসেছে। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড। সাদা রঙের কাঠের বাড়ি টিলার ওপরে একটা সাদা রঙের বাড়ি আমি কতবার স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্ন দেখে ভয় পাওয়া ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, সাহেবরা কত ছেলেমানুষ হয়! বাঘ-ভালুক নয়, শেষ পর্যন্ত আমি মিশাকে ভয় পাবো ? তাও সাদা রঙের মশা ? হাঃ হাঃ হাঃ।

পাঁচশো পাউণ্ড মানে কত টাকা।

যাই হোক না কেন, সেখানে তো আমার প্রায় কোনো খরচই থাকবে না ! দ্বীপে তো সিনেমা হল নেই। কারুকে কিচ্ছু না জানিয়ে চলে যাবো। বাড়িতেও কিচ্ছু বলে যাবো না, সবাই ভাববে আমি অদৃশ্য হয়ে গেছি। বেকার জীবনের জ্বালা সইতে না পেরে চলে গেছি হিমালয়ে, কিংবা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছি ঃ ফিরবো ঠিক এক বছর বাদে, রিটার্ন অব দা প্রডিগাল সান। রাণীর কাছে গিয়ে অথবা আমি একটা দ্বীপের মুকুটহীন রাজা, তুমি যাবে আমার সঙ্গে সেখানে ? তোমার নাম রাণী, পৃথিবীতে আর কোন দেশ খালি নেই, একমাত্র নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, চলো, তুমি সেখানকার সত্যিকারের রাণী হবে।

আমি আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদেরই মতন পরে থাকবো শুধু গাছের পাতা সেলাই করা পোশাক, মাথায় পালকের মুকুট। সমুদ্রের ধারে সবাই মিলে হাঁটু গেড়ে বসে করবো আকাশের সূর্যের পূজা। আমি তাদের শেখাবো রবীন্দ্র সঙ্গীত, 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো···' ।

মাসে একবার শুধু জাহাজ আসবে, সেই জাহাজ চলে গেলে আমার আর কাজ থাকবে না। আমি বেরিয়ে পড়বো নৌকো নিয়ে, একলা নয়, আরও দু-একজন আদিবাসী সঙ্গে থাকবে, হয়তো আমরা পেয়ে যাবো নতুন কোনো দ্বীপ। ওদিকে অনেক ছোটখাট প্রবাল দ্বীপ আছে না ? সেরকম একটা কোনো দ্বীপে আমি প্রথম মানুষ হিসেবে পা দিয়ে তুলে দেবো আমার নিজস্ব পতাকা। তার নাম হবে রাণী দ্বীপ।

সুহৃদ মামা— কী করে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো ? এতদিন পরেও আমার নামটাই আপনার মনে পড়েছে ? আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি কোনো স্বপ্ন দেখেই ভয় পাই না। স্বপ্ন দেখে দেখেই তো আমার সারাটা দিন কেটে যায়। কোনো স্বপ্নই আমার কাছে দুঃস্বপ্ন নয়। সাদা মশা ? কখনো জন্মে শুনিনি, তবে শুনেছি, অস্ট্রেলিয়াতে সাদা রঙের কাক আছে।

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড! নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড! ঠিক এই দ্বীপটাই আমার দরকার ছিল।

টেবিলের ওপর চিঠিটা খোলা পড়ে আছে। অতি সংক্ষিপ্ত তিন লাইনের চিঠি। রেডিও-র সাহিত্য বাসরের জন্য আমি একটা গল্প পাঠিয়েছিলুম, তারা সেটি ফেরত পাঠিয়েছে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করে।

টেবিলের ওপর চাপা দেওয়া ভাত কনকনে ঠাণ্ডা!

।। ছয় ।।

কফি হাউসে রাজনীতি নিয়ে ফাটাফাটি হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। আমরা কলেজ জীবনে ছাত্র ফেডারেশনের পাণ্ডাগিরি করেছি, এখনো সেই গন্ধ যায়নি, কেউ নেহরু নীতির প্রশংসা করলেই আমাদের গা জ্বালা করে।

প্রত্যেকদিন না গেলেও এখনো প্রতি শনিবার দুপুরে কলেজ ষ্ট্রীট কফি হাউসে আমাদের তুমুল আড্ডা হয়। তিনখানা টেবিল জুড়ে পনেরো-ষোলো জন, আমাদের কাছ থেকে পয়সা চাইতে ভয় পায় বেয়ারারা। এই কফি হাউস যেবার হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, আমরাই প্রবল গান গেয়ে এটাকে বাঁচিয়ে রাখার শপথ নিয়েছিলুম না ?

পাঁচটার সময় ভাস্করের নেতৃত্বে নিচে নেমে এলো সবাই। মেট্রোয় পল নিউম্যান এসেছে, 'গরম টিনের চালে বেড়াল' এই নামে ছবি, সঙ্গে ব্রিজিৎ বার্দো, এটা না দেখলে জীবন ব্যর্থ। হৈ-হৈ করে উঠে পড়লুম সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে। জানি, এখন ওপরের ভাঙা হাটে আমাদের প্রতিপক্ষ অরুণ কী বলছে। ঠোঁট উল্টে বিদ্রূপ করে পাশের কারুকে শোনাচ্ছে, এই তো সব প্রগতিশীল! কফি হাউসে বসে বড় বড় কথা বলে টেবিল ফাটাবে, তারপরই ছুটবে মার্কিনী হলিউড-মার্কা ছবি দেখবার জন্য! বেচারা অরুণ! চীনের কোনো সিনেমা এদেশে আসে না বলে ওর কোনো সিনেমাই দেখা হয় না।

মেট্রোর পাশের গলিতে দশ আনার লাইন। এখানে একজন যা পেঁয়াজী আর আলুর বড়া ভাজে, তার তুলনা নেই। ইন্দ্রনাথের ভাষায়, ওয়ার্ল্ড ফেমাস তেলেভাজা! আমার সবচেয়ে ভালো লাগে ডালবড়াটা। কে দাম দেবে ঠিক নেই, খেয়ে তো চললুম যার যা খুশী। একেবারে মাসের গোড়া, উৎপল-ভাস্করদের পকেটে বেশি টাকা থাকবেই। তারপর পেতলের কলসী থেকে ভাঁড়ের চা। আমি একটা সিগারেট ধরাতে না ধরাতেই পারিজাত সেটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল। খুব লম্বা বলে ওর এই একটা সুবিধে।

পল নিউম্যানের সঙ্গে ব্রিজিৎ বার্দো নয়, এলিজাবেথ টেলার। তবে তো একেবারে মার কাটারি!

রুদ্রেন্দু বললো, জীবনে যদি কখনো বিয়ে করি, তা হলে এই লিজ টেলারকে। অবশ্য এ জন্য লিজকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, আমি এখনো চাকরিতে পার্মানেন্ট হইনি।

ভানু একটা হোর্ডিং দেখিয়ে বললো, মাইরি, পরের বইটা দেখেছিস ? বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার, ওটা তো দেখতেই হবে!

নিচের দিকে যেখানে নায়ক-নায়িকাদের নাম লেখা থাকে, হেডিং-এর সেই অংশটায় হাত চাপা দিয়ে পারিজাত বললো, বার্ট ল্যাঙ্কাস্টারের পাশে হিরোইন কে বল তো ?

ভানু বললো, শুধু নাম চাপা দিচ্ছিস কেন, মুখটায় দে, শুধু বুক দেখে বলে দেব ! সোফিয়া লোরেন।

সবাই মিলে আমরা ভানুর পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে ওকে একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিলুম।

কাউন্টারের একেবারে কাছাকাছি এসে আমি বেরিয়ে এলুম লাইন থেকে।

—কী হলো!

—আমার জায়গাটা রাখ, আমি সিগারেট কিনে আনছি।

সিগারেটের দোকান বাঁ দিকে, আমি হাঁটা দিলুম ডান দিকে। বেশ দ্রুত বেগে।

—এই নীলু, কোথায় যাচ্ছিস ?

আমি পেছনে না ফিরে একটা হাত তুলে বললুম, যত লোক আছে, সকলের টিকিট হবে না, তার আগেই ফুরিয়ে যাবে। তাই আমি আমার জায়গাটা ছেড়ে ছিলুম।

—অঢেল টিকিট আছে।

—এই, নীলু দা কেটে পড়ছে।

—এই নীলু, নীলু—

—নীলু শোন, শোন, টাকা আছে আমার কাছে।

ওর আর কেউ ছুটে এসেও ধরতে পারবে না আমাকে। জোরে পা চালিয়ে আমি মিশে গেলুম চৌরঙ্গির ভিড়ের মধ্যে।

টিকিটের দামের জন্য নয়, আমার টিউশানি আছে না ? কাল যেতে পারিনি বৃষ্টির জন্য, আজ শুকনো দিনে আর কাট মারা চলে না। সামনেই পিয়া—বাবুজীর মিড টার্ম পরীক্ষা, এখন আর দায়িত্বজ্ঞানহীন হওয়া আমার মানায় না। আগে এ কথাটা বললে বন্ধুরা আমায় জোর করে ধরে রাখতো নির্ঘাত।

বিদায় পল নিউম্যান, লিজ টেলার! অন্য কোনো সময় আবার দেখা হবে।

একটু একটু মন খারাপ লাগছে ঠিকই। শুধু সিনেমার জন্য নয়, আড্ডার টানটা ছিঁড়ে যেতেই বেশি কষ্ট হয়। তবু, বেশ একটা আত্মত্যাগের ভাব এনে মন খারাপটাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলুম।

হাতে সময় আছে, এখন একটু ফুচকা খাওয়া যাক। মন ভালো না থাকলে ফুচকার মতন ওষুধ আর নেই। ফুচকাওয়ালাকে বললুম, খুব ঠেসে ঝাল দাও তো ? দেখি তোমার শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো কত আছে। আমায় যদি কাঁদাতে পারো তো বুঝবো তোমার হিম্মৎ।

আট আনার ফুচকা খেয়ে শরীর, মন বেশ চাঙ্গা হলো। এখনো ভালো করে অন্ধকার নামেনি। ময়দানের মধ্য দিয়ে কোনাকুনি হেঁটে গেলে চিড়িয়াখানার কাছ থেকে বাস ধরা যেতে পারে। রেসকোর্সের দিকের আকাশটা অদ্ভুত রকমের লাল। ক্যাজুরিনা এভিনিউয়ের কাছে কোথা থেকে ছুটে এলো বিনা পয়সার দুর্দান্ত মোহময় হাওয়া, আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিল একেবারে। আধো—আলো আধো—ছায়ায় ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালকেও অপূর্ব দেখাচ্ছে। আমাদের এই কলকাতা শহরটা কত সুন্দর, কোথায় লাগে প্যারিস—লণ্ডন! এরকম কৃষ্ণচূড়া গাছ আর কোথায় আছে।

রেলিং-এ একলা দাঁড়িয়ে একটা লোক উদাস মুখে আকাশ দেখছে। ওর দিকে তাকিয়েই আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। বিষম চেনা মনে হচ্ছে লোকটিকে। কোথায় দেখেছি ? আমার চেয়ে অন্তত বছর দশেক বড় লোকটি এই রকম শেষ বিকেলে ময়দানে একলা দাঁড়িয়ে আছে কেন ? ওর কি কোনো বন্ধু নেই ? কোথাও যাবার জায়গা নেই ?

লোকটি মুখ নিচু করতেই আমি আরও চমকে উঠলুম। ঠিক যে আমার মতন মুখ! এমন আশ্চর্য মিল মানুষে মানুষে হয় ? আমার দাদার সঙ্গে আমার মুখের তেমন মিল নেই, কিন্তু যে-কেউ এই লোকটিকে দেখে বলবে আমরা দুই সহোদর।

আমার সব সময়ই সন্দেহ, এই পৃথিবীতে ঠিক আমার মতন চেহারার একটা মানুষ আছে। সে আমার চেয়ে অনেক ভালো ভাবে বেঁচে যাচ্ছে। এই কি সেই লোক ? কিন্তু ও আমার চেয়ে বয়েসে বড়! লোকটি যাতে আমায় দেখতে না পায় তাই আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলুম।

দোতলার দরজা খুলতেই রঘু খবর দিল, দিদিমণি-খোকাবাবুরা তো এইমাত্র বেরিয়ে গেল।

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, যাঃ!

তাহলে আমি মেট্রো সিনেমায় লাইন ছেড়ে চলে এলুম কেন শেষ মুহূর্তে? কেন বন্ধুদের ছেড়ে....।

— কে, মাস্টারমশাই ?

সুনেত্রা দেবী বেরিয়ে এলেন শোওয়ার ঘড় ছেড়ে। ওঁকে দেখলে মনে হয়, ওঁর কোনো শৈশব ছিল না ; কোনোদিন উনি এলোমেলো কিংবা সাদামাটা পোশাকে থাকেন নি। ঐরকম সুন্দর, সুসজ্জিত বেশে যৌবন বয়েস ওঁকে স্বর্গ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, পৃথিবীতে। —ও মা, দেখেছো, ওদের কাণ্ড! আপনি যে আজ আসবেন, ওরা জানতো ? ওরা দু'জনেই জোর দিয়ে বললো, আজ মাস্টারমশাই আসবেন না।

আমি লজ্জিতভাবে আমতা আমতা করে বললুম, না মানে, বৃষ্টির জন্য কাল আসতে পারিনি।

— সেইজন্যই বোধ হয় ভেবেছে, আজও আসবেন না। আমিও কিছু বললুম না। পিয়ার এক বন্ধুর জন্মদিন ও প্রত্যেকবার যায়। আর বাবুজীও বললো, লেক ক্লাবে কী একটা ফাংশান আছে।

— ঠিক আছে, আমি কাল আসবো।

— কাল তো রবিবার। কাল কি ওরা পড়তে চাইবে ? আপনি সোমবারই আসবেন। এ কি, যাচ্ছেন কেন, বসুন।

সুনেত্রা দেবীকে আমি প্রথম প্রথম বেশ কয়েকবার বলেছি, আমাকে আপনি বলবেন না, তুমি বলবেন। উনি শোনেননি। অথচ ওঁর প্রতিটি কথার মধ্যে চমৎকার স্নেহ।

— পায়ের ব্যথাটা একদম সেরে গেছে ?

সামনাসামনি মিথ্যে কথা বলতে আমার খুবই লজ্জা করে। তা ছাড়া সুনেত্রা দেবীর ব্যবহারে এমন সারল্য আছে যে ওকে ঠকাতে ইচ্ছে করে না। একবার ভাবলুম সত্যি কথাটাই বলে ফেলি! সেটাও ঠিক মুখে এলো না।

— হ্যাঁ অনেকটা।

— একদম অযত্ন করবেন না, পা বলে কথা। বসুন, আমি আজ পুডিং বানিয়েছি, একটু চেয়ে দেখবেন। ছেলেমেয়ে দুটো তো খেলোই না।

— আমার কিন্তু আজ একদম খিদে নেই।

— পুডিং বুঝি, কেউ খিদের জন্য খায় ?

এমন স্বাভাবিকভাবে উনি কথাটা বললেন যে এর যেন কোনো প্রতিবাদই চলে না। অথচ কী বাজে একটা শৈশব আমার কেটেছে, সব সময় পেটের মধ্যে একটা খাই খাই ভাব। শুধু খিদের জন্যই খায় না, এমন শখের খাদ্য আছে পৃথিবীতে? আমার খিদে আছে, কোনো খাদ্য নেই এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে ঢের!

পিয়ার বাবার সঙ্গে আমার খুবই কম দেখা হয়েছে। উনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ, বাড়ি ফেরেন অনেক রাত করে। ছেলেমেয়েরা নেই বলে এতবড় ফ্ল্যাটটা একবারে ঠাণ্ডা। শুধু শোওয়ার ঘরে কোনো রেকর্ড প্লেয়ারে একটা বাজনা বাজছে। বিটোফেনের নাইনথ সিমফোনি। ঐ একটাই নাম আমি জানি।

খাবার ঘরের টেবিলে আমাকে পুডিং দিয়ে সুনেত্রা দেবী উল্টো দিকে বসলেন। যতবার উনি বাঁ দিকে মুখটা ফেরাচ্ছেন, আমি চমকে চমকে উঠেছি। আগে কোনোদিন লক্ষ্য করিনি, একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেল থেকে ওঁকে রাণীর মতন দেখায়। হুবহু মিল! নাকি আমি বিশ্বময় সকলকেই রাণীর মতন দেখেছি ?

হঠাৎ ইচ্ছে হলো আমি উঠে গিয়ে সুনেত্রা দেবীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ওঁর পায়ের পাতা দুটি চেপে ধরি। সেখানে ফেলি দু' ফোটা চোখের জল, আমার কৃতজ্ঞতার উপহার। বন্ধুদের ছেড়ে এসে আমার যে মন খারাপ লাগছিল, তা হঠাৎ একেবারে' চলে গেছে। এই যে একটু দূরে বাজছে সুদূর বিলিতি বাজনা, টেবিলের উল্টোদিকে বসে সুনেত্রা দেবী আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছেন, আমি চামচে দিয়ে একটু একটু করে পুডিং মুখে তুলছি, সব মিলিয়ে এই ঘটনা বা দৃশ্যটি যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

সত্যি সত্যি তো আর উঠে গিয়ে ওঁর পায়ের পাতা ছোঁয়া যায় না, তাই আমি মাথা নিচু করে কল্পনায় চকিতে ব্যাপারটা সেরে নিলুম।

আমি এত ফাঁকি দিই, প্রায়ই কামাই করি, তবু আমার সঙ্গে এত সুন্দর ব্যবহার করেন কেন সুনেত্রা দেবী ? ওঁর হৃদয় সুন্দর বলেই মুখখানি এত সুন্দর!

— আপনি কবিতা লেখেন ?

আমার সারা শরীরে একটা চমক লাগলো। ঠিক যেন জ্যান্ত বিদ্যুতের তারের ছোঁয়া লেগেছে।

— আমি ? না তো ?

— বুদ্ধমামা যে বললো।

— বুদ্ধমামা ? তিনি কে ?

— বুদ্ধদেব বসু, আপনি নাম শোনেন নি ? উনি তো আমাদের মামা হন।

— হ্যাঁ, বুদ্ধদেব বসুর নাম কে না শুনেছে। কিন্তু আমার নাম জানবেন কী করে উনি ?

—পিয়া গিয়েছিল ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। ও তো কলকল করে অনেক কথা বলে, কী যেন সব বলেছিল আপনার সম্পর্কে তখন বুদ্ধমামা বললেন, ওই ছেলেটি তো আমার কাগজে দু'একটা কবিতা লিখেছে! আপনি লেখেন নি ?

—না, মানে, সে অতি সামান্য···

—তাই শুনে পিয়ার বাবা কী বলেছে জানেন ? ও বললো, ওরে বাবা মাষ্টারমশাই কবিতা লেখেন ? কবিরা তো খায় না, দায় না, শরীরের কোনো যত্ন নেয় না, সমাজ-সংসার গ্রাহ্য করে না, অল্প বয়সে মারা যায়। তোমরা একটু যত্ন-টত্ন করো ছেলেটিকে। সেদিন পা ভেঙেছে, কোন দিন মাথা ফাটাবে।

চক্রধরপুর থেকে মাইল পনেরো দূরে পাহাড়ের ওপর আমরা একবার একটা ঝর্ণা আবিষ্কার করেছিলুম, সুনেত্রা দেবী ঠিক সেই ঝর্ণার শব্দের মতন হাসতে লাগলেন।

আমিও হাসি চাপতে পারলুম না। পিয়া-বাবুজীর বাবা কোনোদিন এক লাইন কবিতা পড়েছেন কি-না সন্দেহ। কবিদের সম্পর্কে এরকম অদ্ভুত ধারণা হলো কী করে কে জানে!

—নিন, আপনি আর একটু পুডিং নিন!

—আপনি কি সত্যি ভেবেছেন নাকি যে আমি সারাদিন না খেয়ে থাকি ?

আবার সেইরকম হাসি। হাসতে হাসতেই আর খানিকটা পুডিং জোর করে তুলে দিলেন আমার প্লেটে। তারপর বললেন আমি জীবনে কোনোদিন কোনো কবিকে দেখিনি। এই প্রথম আপনাকে দেখলুম।

—বাঃ, বুদ্ধদেব বসুকেই তো···

—ওঃ হো! তাওতো ঠিক। তবে ওকে আমাদের মামা হিসেবে চিনি তো। সেই জন্য কখনো মনে হয়নি।

—আমি অতি সামান্য, মানে কখানো-সখনো দু'একটা···

—কী করে কবিতা লেখেন ? এমনি এমনি মাথাতে আসে ?

এ প্রশ্নের আর উত্তর দিতে হলো না আমাকে। ঝনঝন করে পাশের ঘরে টেলিফোন বাজলো, সুনেত্রা দেবী উঠে গেলেন।

পুডিংটা সত্যি চমৎকার লাগলো, চেটেপুটে শেষ করে আমি চুপ করে বসে রইলুম। এই পরিবারটি সম্পর্কে একটা নতুন ধারণা জন্মে গেল আজ। বুদ্ধদেব বসুর মতন লেখক এদের আত্মীয় ? আমার ধারণা ছিল, বুদ্ধদেব বসু ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন লেখকরা কারুর মামা, কাকা, জ্যাঠা পিসে হন্ না। ওঁরা স্বয়ম্ভু।

বুদ্ধদেব বসুর পত্রিকাতে তো কত লোকই কবিতা লেখে, উনি প্রত্যেকের নাম জানেন ? আমায় কোনোদিন দেখেননি, তবু আমায় মনে রেখেছেন ? আশ্চর্য ব্যাপার! আমার মাত্র দুটো লেখা ছাপা হয়েছে ওঁর পত্রিকায়।

সুনেত্রা দেবী টেলিফোনে অনেকক্ষণ কথা বলছেন। আমার এবার ওঠা উচিত। কিন্তু না বলে কি চলে যাওয়া যায় ? একটুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলুম। টেলিফোনের সময় এখান থেকে চেঁচিয়েও কিছু বলা উচিত নয়। এক গেলাস জল পেলে ভালো হতো। মুখটা মিষ্টি হয়ে গেছে। উঁকিঝুঁকি মেরে রঘুকে দেখতে পেলুম না।

টেলিফোন শেষ করে সুনেত্রা দেবী এসে দাঁড়ালেন দরজার কাছে। এত হাস্যোজ্জ্বল ছিল মুখখানা, এখন হঠাৎ ম্লান হয়ে গেছে, টেলিফোনে কেউ দুঃখ দিয়েছে ওঁকে ? কেন ? কে সেই পাষণ্ড ?

—আমি এবার যাই!

মুখে কিছু না বলে উনি ঘাড় নাড়লেন, আমার মনে হলো, আমি চলে গেলেই উনি কাঁদবেন। পৃথিবীটা কেন এত নিষ্ঠুর হয় ? এই চমৎকার সন্ধ্যায় সুনেত্রা দেবীর মনে কষ্ট না দিলে কি কারুর চলতো না ? জল চাওয়া হলো না, আমি নেমে গেলুম সিঁড়ি দিয়ে।

একটু বাদেই কিন্তু সুনেত্রা দেবীর ম্লান মুখখানা ভুলে গেলুম আমি। আমার মনটা ফুরফুরে হয়ে আছে। বুদ্ধদেব বসু আমার নাম মনে রেখেছেন! চেনা নেই, শোনা নেই, উত্তর কলকাতা থেকে ডাকে কবিতা পাঠাই···

জল না খেলে চলবে না। কোনো দোকানে ঢুকে এক গেলাস জল চাইবো ? শুনেছি, জল চাইলে এ দেশে কেউ না বলে না। যদি আমাকেই প্রথম কেউ প্রত্যাখ্যান করে। দরকার কী, রাস্তায় তো টিউবওয়েল আছেই, করপোরেশন করে রেখেছে জলের ব্যবস্থা।

এক হাতে পাম্প করে অন্য হাতে জল খেতে খুব অসুবিধে, তবু কাজ চালিয়ে নিলুম কোনো রকমে। জামার ডান হাতটা ভিজে গেল। একটু আগে একটি সুদৃশ্য সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাটে এক সুন্দরী রমণী আমাকে অতি চমৎকার পুডিং নিজে পরিবেশন করে খাওয়ালেন, তারপর জল খেতে হলো রাস্তার কলে। জীবন যাপনের এই সবই মজা। বুদ্ধদেব বসু আমার নাম মনে রেখেছেন!

আজ ভবানীপুরে যাবার দিন। ডান হাতের তালু চুলকোচ্ছে কেন? তা হলে আজ নিশ্চয়ই ওরা মাইনে দেবে। আর কোনো কুসংস্কারে আমার ঠিক বিশ্বাস নেই, তবে এই তালু চুলকোলে টাকা-পয়সার ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছা করে। ভবানীপুরের দত্ত বাড়িতে ওরা যে মাইনে দেয় তা নয়, কিন্তু কবে যে দেবে তার ঠিক নেই। কোনো কোনো মাসে কুড়ি তারিখও হয়ে যায়। ওটা যে আমার ব্যক্তিগত হাত খরচের টাকা।

মাইনে না পাওয়ার অভিজ্ঞতাও আমার আছে। কিছুদিন পড়িয়েছিলাম এক অতি বিখ্যাত বাড়িতে, সে পরিবারের একজনের লর্ড উপাধি আছে পর্যন্ত, পরপর তিন মাস মাইনেই দিল না। দারুণ বড়লোক তো, তাই এসব ছোটখাটো ব্যাপার তাঁদের মনেই থাকে না। মুখ ফুটে চাইবার ক্ষমতাই আমার নেই। দুর ছাই বলে ছেড়ে দিলুম পড়ানো, তবু তাঁরা ভ্রূক্ষেপও করলেন না একটা মাস্টার এলো কি এলো না, তাতে ওঁদের কিছু যায় আসে না।

চৌদ্দ বছর বয়েস থেকে এর মধ্যেই এত টিউশানি করেছি আমি যে এই বিষয়ে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া লিখতে পারি। মদনমোহনতলায় এক জায়গায় পড়িয়েছিলুম কয়েক মাস, সেখানে ছাত্রের দিদি মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বলতেন, একি, দু'জনেই যে চুপচাপ দেখছি, তা হলে পড়া হচ্ছে কী করে ? অ্যাঁ ? একদিন পড়িয়ে চলে যাচ্ছি, সদর দরজা পেরিয়ে পা দিয়েছি রাস্তায়, ছাত্রটি ছুটে এসে আমায় আবার ধরলো। দিদি ডাকছেন। অবাক হয়ে ফিরে যেতেই দিদিটি বললেন, মাস্টারমশাই, আপনার দু'ঘন্টা পড়াবার কথা, আপনি এক ঘন্টা পঁয়তিরিশ মিনিটেই চলে যাচ্ছেন যে ? কাল গিয়েছেন এক ঘন্টা বিয়াল্লিশ মিনিটে, আমি লক্ষ্য করেছি এমনভাবে পড়ালে ও ছেলের ভবিষ্যতে কিছু হবে ? টাকাগুলো তো ঠিক গুণতে হচ্ছে—।

তারপর ভয়ে আর এক বছর আমি মদনমোহনতলার ধার-কাছ দিয়ে হাঁটিনি।

ডান হাতের তালু চুলকোবার ফল আজ হাতেই পেলুম।

ভবানীপুরের ছাত্রটি পড়ে ফার্স্ট ইয়ারে, একেবারে নিপাট ভালো মানুষ ছেলে। নামটিও সুশান্ত। কলেজে পড়া ছেলে এমন লাজুক হয় কদাচিৎ, পড়াশুনোতেও মোটামুটি ভালো। একে পড়ানোতেও আমার কোনো কষ্ট নেই। যা হোম ওয়ার্ক দেবো সব করে রাখবে, বই-খাতাপত্র নিখুঁত গুছোনো, ওর তিনদিনের পড়া একদিনে পড়ানো যায়।

এদের খুব বড় সংসার। সুশান্তর বাবা কী কাজ করেন তা আমি জানি না, কোনো এক ধরনের ব্যবসাই হবে বোধ হয়, কলকাতায় থাকেন না প্রায়ই। সুশান্ত এত কম কথা বলে কিন্তু বাড়ির মধ্যে খুব চেঁচামেচি লেগেই থাকে সবসময়। টুকরো টুকরো কথা শুনে বুঝতে পারি, এই পরিবারে মাঝে মাঝে খুব টাকার টানাটানি হয়, আবার মাঝে মাঝে খুবই স্বচ্ছল অবস্থা। কোনো কোনো মাসে আমি চায়ের সঙ্গে দু'খানা বিস্কুট পাই, কোনো কোনো মাসে শুধু চা। একদিন রাত আটটায় সুশান্তর বাবা একজোড়া বড় ইলিশ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন সেদিন আমিও দু' পীস ইলিশ মাছ ভাজা খেয়েছিলুম।

সুশান্তর বাবা দুলালবাবু বেশ হাসিখুশী লোক। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে গল্প করতে আসেন। এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করেন, যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই! হঠাৎ একদিন জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন তো, এই যে এত টাকা-পয়সা খরচা করে ভাকরা-নাঙ্গাল তৈরি হলো, তাতে আমাদের মানে আমাদের এই বাঙালীদের কী লাভ হলো ? যেন এর উত্তর আমার জানবার কথা!

কিংবা হয়তো বললেন, আচ্ছা, আপনি বলুন, এই যে দলে দলে রিফিউজি আসছে এখনো, এদের সব কটাকে ধরে ধরে আন্দামানে চালান করে দেওয়া উচিত না ? বলুন ?

প্রশ্নটা করেই এমন ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে থাকেন, যেন আমারই মতামতের ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। আমি হ্যাঁ বললেই সব রিফিউজি জাহাজ-ভর্তি হয়ে চালান হয়ে যাবে।

—এই বাঙালগুলোর জন্য কলকাতা শহরটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল না ? কী ছিল আগে। এখন দেখুন শিয়ালদা স্টেশন,একটা আঁস্তাকুড়…

এ বাড়িতে আমি খুব সাবধানে থাকি, কোনো কথায় চন্দ্রবিন্দু বাদ দিই না। এমন কি হাসপাতালকেও বলি হাঁসপাতাল।

সুশান্তকে পড়ানো শেষ হয়ে গেছে, দুলালবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, কী খবর মাস্টারমশাই, কদিন আসেননি শুনলুম, জ্বর-টর হয়নি তো ?

—না, তা নয়।

—দেশের হাল-চাল কেমন বুঝছেন ? এই যে সরষের তেলের দর একবার বাড়তে শুরু করলে, আর নামবে কোনোদিন ? আপনি বলুন ?

—হেঁ, হেঁ, মানে।

—পাকিস্তান আবার আমাদের অ্যাটাক করবে। আমি বলছি কী, আপনি বলুন করবে কি না।

—হেঃ হেঃ হেঃ!

—দিল্লীতে বসে আছে যতগুলো সব নিন কম পুফ…ও আই অ্যাম স্যরি…আচ্ছা, আপনিই বলুন, এই যে মাছের দামও বাড়ছে, সোনার দামও বাড়ছে আর কোনো কানট্রিতে এমন হয় ?

এবার আমার ইকনমিকস পড়া বিদ্যে মাথার মধ্যে গজগজিয়ে ওঠে। আমি বিজ্ঞের মতন বলি, সোনার দাম বাড়লে তো অটোমেটিক্যালি সব জিনিসের দাম বাড়বেই।

আসলে, সোনার দাম তো এরকম বাড়ে না, সোনার ইন্টারন্যাশনাল প্রাইস আছে, যে-কোনো দেশে সোনার দাম বাড়া মানে সেই দেশের মানি ভ্যালু কমে যাওয়া। মানির পারচেজিং পাওয়ার···

—ওঃ, আপনার মাইনেটা দেওয়া হয়নি ····।

—ঠিক আছে পরের দিন এসে।

—না, না, আজই দিচ্ছি। এই খোকা কাগজ-পেন্সিল দে তো।

সুশান্ত এই সময় ঘর ছেড়ে উঠে চলে গেল। অন্যান্য মাসে সুশান্তর মা-ই খামে করে টাকাটা দেন, দুলালবাবু এই প্রথম। কাগজ-পেন্সিল কেন ?

—আপনি এ মাসে তিনদিন আসেননি শুনলুম— বারো দিনের মধ্যে তিনদিন, তার মানে ওয়ান ফোর্থ ওয়ার্কিং ডেইজ, তাই না ?

আমি হ্যাঁ। বলে কি লোকটা? কুলি-মজুরের রোজ হিসেব করছে কেন ?

—মাসে পঁচাত্তর টাকা হলে তার ওয়ান ফোর্থ····এই ধরুন চার উনিশ ছিয়াত্তর, তাহলে উনিশ বাদ যাবে····সেভেন্টি ফাইভ থেকে উনিশ বাদ গেলে··ছয়··হাতে রইলো এক ছাপান্ন ফিফটি সিক্স, তাই না ? কি মাস্টারমশাই হিসেবটা ঠিক আছে ?

আমি স্তব্ধ।

পকেট থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট বার করে উনি বললেন, খুচরো··আপনার কাছে চারটে টাকা আছে ?

—না, থাক না বাকিটা।

—আরে না, না, থাকবে কেন ? আমি নিয়ে আসছি ভেতর থেকে। এই শিবু, শিবু, তোর মায়ের কাছ থেকে চারটে টাকা নিয়ায় তো।

—একবার সুশান্তকেও ডাকবেন ?

আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। রেগে উঠবার কথা, তার বদলে কেন যেন দারুণ অভিমান হয়। আমি দুলালবাবুর দিকে তাকাতে পারি না।

সুশান্ত এলে আমি বললুম, তুমি তো নিজেই খুব ভালো লেখাপড়া করো, আমার সাহায্য ছাড়াই রেজাল্টও নিশ্চয়ই ভালো করবে, আমি কাল থেকে আর আসবো না।

দুলালবাবু রীতিমত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মশাই, আপনি কাল থেকে আর আসবেন না ?

—না মানে।

—কেন ?

—আমি একটা চাকরি পাচ্ছি, কলকাতার বাইরে চলে যেতে হবে।

—চাকরি পাচ্ছেন ? ভেরি গুড! ভেরি গুড! কোথায় পেলেন ?

—জি কে ডব্লু!

সুশান্ত নিচু হয়ে আমায় প্রণাম করতে যেতেই আমি ওকে ধরে ফেললুম। দাঁতে দাঁত চেপে থাকতে হলো আমাকে কান্না সামলাবার জন্য। এরা বোঝে না কেন যে ছাত্রদের ছেড়ে যেতে হলে অনেক সময় মাস্টারদেরও কষ্ট হয় ? সুশান্ত ছেলেটিকে আমি সত্যি খুব ভালোবাসতুম!

প্রকৃতির নিয়মই এই যা দেয় তার চেয়ে বেশি ফিরিয়ে নেয়। আজ সুনেত্রাদেবীর সঙ্গে কিছুক্ষণ থেকে সে সুন্দর সন্ধ্যেটি পেয়েছিলুম, তারপর রাত্রে এই ভবানীপুরের বাড়িতে এরকম উল্টো ঘটনা আজই না ঘটলে কি চলতো না ?

না, তবু আজ আমি বেশিই পেয়েছি। রাত্রের তুলনায় সন্ধ্যেটি অনেক ভালো। কবিরা না খেয়ে থাকে, তাড়াতাড়ি মরে যায়, হাঃ হাঃ! বুদ্ধদেব বসু আমার নাম জানেন ?

গ্রীস আর রোমের দেবদেবীদের কাহিনীর একটা বই খুঁজছিলাম কলেজ স্ট্রীটের রেলিং-এ। ঠিক যে-সময় যেটির দরকার, সেটাই পাওয়া যাবে না। নতুন বই হয়তো পাওয়া যেতে পারে, পকেটে পয়সাও আছে, কিন্তু নতুন কিনলে চলবে না। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, কালকে বাবলুকে পড়ার পরে গল্প শোনাতে যেতেই মালবিকা এসে উপস্থিত। তখন আমায় গল্প বদলাতে হলো। কেন যে তখন মনে এলো দফনে আর নারসিসাসের কাহিনী। সেটা বলার পরই মালবিকা বললো, এই বইটা আপনার বাড়িতে আছে ? আমিও তক্ষুণি উত্তর দিয়েছিলুম, হ্যাঁ। ব্যাস, অমনি মালবিকার হুকুম ঐ বইটা তার চাই। এখন নতুন বই কিনে নিয়ে গেলেই ঠিক ধরে ফেলবে। ঐটুকু মেয়ে, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

কাল মালবিকা আমায় খুব নাস্তানাবুদ করেছে। এক একটা প্রশ্ন করে আর বাবলু হেসে লুটোয় ?

মাস্টারমশাই, আপনি মোনালিজা ছবিটার নাম শুনেছেন ?

— মোনালিজা না মোনালিসা ?

— ঐ যাই হোক। ওদেশে বলে মোনালিজা। নাম শুনেছেন তো। আচ্ছা বলুন তো, ছবিটা কে প্রথম কিনেছিল ?

— কে কিনেছিল ? কে কিনেছিল ? মোনালিজা, মোনালিসা নাঃ, আমি তো যতদূর জানি, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ছবিটা এঁকেছিলেন এক বিবাহিতা মহিলাকে দেখে··· তারপর ছবিটা সেই মহিলার কাছেই ছিল!

মোটেই না! কে কিনেছিল বলুন মাস্টারমশাই ?

— তা কী করে জানবো ?

— ওমা, আপনি জানেন না ? যে ভদ্রমহিলাকে দেখে আঁকা হয়েছে ঐ ছবিটা, সেই ভদ্রমহিলার স্বামী ঐ ছবিটা একদম পছন্দ করেননি। ওটার জন্য দামও দিতে চাননি। তারপর ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস ওটা কিনে নেন, বাথরুম সাজাবার জন্য!

বাবলু অমনি হাততালি দিয়ে বলে উঠেছিল, বাথরুম সাজাবার জন্য, বাথরুম সাজাবার জন্য, হি-হি-হি-হি! হাসতে হাসতে একেবারে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

আমি বলেছিলুম, ও, তাই বুঝি। তারপর চেয়ার ছেড়ে যেই উঠে দাঁড়াতে গেছি, অমনি আর একটা প্রশ্ন।

— মাস্টারমশাই, বলুন তো, একটা পাথরের মূর্তি কতবড় হতে পারে ?

— যতবড় ইচ্ছে ততবড় হতে পারে।

— না। ধরুন, কোনো মেয়ের মূর্তি, এরকম সবচেয়ে বড় মূর্তি কোথায় আছে ?

— জানি, এটা জানি। স্ট্যাচু অব লিবার্টি এটা আমেরিকায় নিউ ইয়র্ক না কোথায় যেন আছে।

— মোটেই না। তলোয়ার হাতে একটা মেয়ের মূর্তি, তার নাম মাদারল্যাণ্ড, সেটা আছে রাশিয়ার ভলগোগার্ড শহরে। পা থেকে তলোয়ারের ডগা পর্যন্ত দুশো সত্তর ফুট— ।

— মালবিকা, তুমি এতসব জানলে কী করে ? বিলেতে গিয়ে বুঝি শিখেছো ?

— বিলেতের লোকও মোটেই এসব জানে না!

বাবুল হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, দিদি মাস্টারমশাইয়ের চেয়ে অনেক বেশি জানে!

ভাইবোনে এমন হাসছিল যে পাশের হলঘর থেকে ওদের দাদু ধমক দিয়ে উঠলেন, এই অত গোলমাল কিসের ? পড়াশুনো না কাতুকুতু হচ্ছে, অ্যাঁ ?

ঐটুকু মেয়ে মালবিকা, অমন ফুটফুটে সুন্দর চেহারা, কিন্তু আমাকে বোকা বানানোতেই ওর সবচেয়ে বেশি আনন্দ।

জেনারেল নলেজ না বাড়ালে টিউশানি করতে গিয়ে মান-সম্মান রক্ষা করা খুব কঠিন। যেসব খবর আমি জানি না, তা ঐটুকু ছেলেমেয়েরা জানতে পারে কী করে ? বাথরুম সাজাবার জন্য মোনালিসা ছবিটা কিনেছিলেন ফ্রান্সের সম্রাট ? এটা সত্যি কথা ? মালবিকা অবশ্য মিথ্যে কথা বলার মতন মেয়ে নয়। আর একদিন আমি বাইবেলের ডেভিড আর দৈত্য গোলিয়াথের গল্পটা বলতে গিয়েছিলুম। প্রথমেই মালবিকা আমায় সংশোধন করে দিয়েছিল গোলিয়াথ না মাস্টারমশাই, গোলায়াথ। ইংরেজি ইস্কুলে পড়ে সঠিক উচ্চারণটা মালবিকার পক্ষে জানা সম্ভব, কিন্তু ও কী করে বললো, ঐ গোলায়াথের উচ্চতা ঠিক ছয়ফিট দশ ইঞ্চি?

খুঁজতে খুঁজতে একটা বই পেয়ে চমকে উঠলুম। গীনেস বুক অব রেকর্ডস। এই বইয়ের অস্তিত্বের কথাই আমার জানা ছিল না। কোনোদিন নাম শুনিনি! অথচ এই তো সেই আশ্চর্য বই। প্রথম পাতাতেই রয়েছে দীর্ঘতম মানুষের কথা। তাহলে এই বই দেখেই মুখস্থ করে মালবিকা আমায় ঠকায়। গ্রীস-রোমের উপকাথা না খুঁজে সেই বইটাই কিনে ফেললুম দরাদরি করে। মালবিকাকে বললেই হবে, আমার বইটা হারিয়ে গেছে!

পুরো বইটা মুখস্থ করার পর সবাই দেখবে, প্রাইভেট টিউটর হিসেবে আমার কত প্রতাপ। পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রথম কবিতার বইটি ছাপা হয় কোথায় ? কোরিয়াতে ১১৬০ সালে। শেক্সপীয়রের মোট কটা নিজের হাতের সই এখনো টিকে আছে ? মাত্র ছটা। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট স্বাধীন দেশ কোনটা ? ভ্যাটিকান সিটি।

এরপর দু'দিন বন্ধুবান্ধবদের কান ঝালাপালা করে দিলুম একেবারে। কথায় কথায় জ্ঞানের প্রশ্ন। কেউ উত্তর দিতে পারে না। তারপর ভাস্কররা সিদ্ধান্ত নিল যে ফের আমি ওরকম কোনো প্রশ্ন করলেই আমার মাথায় সবাই মিলে গাঁট্টা মারবে।

মাঝরাত্রে জেগে উঠে মনে হয়, আচ্ছা, মানুষ সবচেয়ে কত বড় স্বপ্ন দেখতে পারে, তাও কি ঐ বইটাতে আছে ? কৌতূহলটা এমনই তীব্র হয়ে ওঠে যে আলো জ্বেলে বইটার পাতা ওল্টাই। তাও তো আছে দেখছি, শিকাগোর বিল কারস্কাডন নামে একটা লোক দু'ঘন্টা তের মিনিট ধরে একটা স্বপ্ন দেখেছিল, সেটাই রেকর্ড। মাত্র দু'ঘন্টা তের মিনিট ? ওরা জানে না।

ভবানীপুরের টিউশানিটা ছেড়ে দিয়ে মনটা খচখচ করছিল। সামনের মাস থেকে আমার হাত খরচ চলবে কী করে ? মা-র কাছ থেকে এমনিতেই পাঁচ-দশ টাকা নিতে হয়।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল নিখিলদার কথা। অনেকদিন দেখা হয়নি। দুপুরে কোনো কাজ নেই, শিয়ালদা পর্যন্ত ট্রামে গিয়ে বাকিটা হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলুম বেলেঘাটায়।

— দরজা খুলে নিখিলদা বললেন, নীলু, তুই চিনতে পারলি আমার বাড়ি ? সেই তো একবার মাত্র এসেছিলি। আয়, ভেতরে আয়। সুদীপা, কে এসেছে দেখো!

একখানা মাত্র ঘর নিখিলদার। ওপরে টিনের চাল । পেছন দিকে একটা খোলা বারান্দা, সেখানে উনুন পেতে রান্না। সুদীপাদি এই বেলা আড়াইটের সময়ও রান্না করছেন। গরমে, আগুনের আঁচে,সুদীপাদির ঘামে ভেজা মুখখানা চকচক করছে। ঠিক যেন গর্জন তেল মাখানো দেবী প্রতিমার মুখ। পরে আছেন একটা দামী বেনারসী শাড়ি, বোধ হয় কোনো আটপৌরে শাড়িই নেই সুদীপাদির। বিরাট বড়লোকের মেয়ে, আমাদের প্রথম কলেজ জীবনে উনি ছিলেন নামকরা ছাত্রনেত্রী। নিখিলদার কোনো চালচুলো নেই, তবু পাগলের মতন নিখিলদার প্রেমে পড়ে গেলেন সুদীপাদি।

রান্না মানে শুধু খিচুড়ি। তারই মধ্যে আলু সেদ্ধ, বেগুন সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ। হাঁড়িটা শুদ্ধ ঘরের মধ্যে এনে সুদীপাদি বললেন, তুমিও আমাদের সঙ্গে বসে যাও নীলু!

— আমি এইমাত্র খেয়ে এসেছি, সুদীপাদি।

— তাতে কী হয়েছে, আবার খাও।

— পারবো না একদম, পারবো না, পেট একেবারে ভর্তি।

— অমন পেট ভর্তি করে বাড়িতে খাও কেন ? কি রকম খিচুড়ি রাঁধলুম একটু টেস্ট করবে না ?

অগত্যা একটা প্লেট নিয়ে বসতেই হলো ওঁদের সঙ্গে। সত্যি অপূর্ব স্বাদ খিচুড়ির। না না করেও খেয়ে ফেললুম অনেকটা। নিখিলদা কাঁচা লঙ্কা খেতে পারেন-বটে, কচ্‌কচ্‌ করে এক একটা কাঁচা লঙ্কা কামড়াচ্ছেন যেন টিয়া পাখি।

আচমকা নিখিলদা জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে নীলু পৃথিবীটা এই রকমই থাকবে ? সবাই পাস-টাস করে চাকরি-বাকরিতে ঢুকবে, বিয়ে করে সংসারী হবে, তারপর ছেলেপুলের জন্ম দেবে আর চোর-জোচ্চোর-বদমাশরা আপন মনে রাজত্ব চালিয়ে যাবে ?

আমি প্রথমে একটু লজ্জিত বোধ করলুম। একদিন নিখিলদাকে আমিই জিজ্ঞেস করেছিলুম পৃথিবীটা কি এই রকমই থাকবে ? আপনারা এত যে বক্তৃতা দিচ্ছেন, মিছিল আর স্লোগান···তাতে কোনো কিছু কি বদলাবে ?

পরক্ষণেই মনে হলো নিখিলদাই বা কী করছেন ? তিনিও তো বিয়ে করে সুন্দরী বউয়ের সঙ্গে বসে আরাম করে খিচুড়ি খাচ্ছেন। জীবনটা যেন একটা পিকনিক। সারাটা জীবন যদি এইভাবেই কেটে যায় তো মন্দ কী!

— নিখিলদা, সেই কথাটাই তো আবার জানতে এলুম আপনার কাছে।

সুদীপাদি বললেন, তুমি ঠিক দিনে এসেছো, নীলু। কালই আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

— কোথায় ?

— আমি মেদিনীপুরে আর নিখিল যাচ্ছে বাঁকুড়ায়।

— দু'জনে দু'জায়গায় ? চাকরি ?

— নাঃ চাকরি নয়! তুমি বুঝি চাকরি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারো না ?

নিখিলদা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় চাকরি করছো, নীলু ?

— বাবার হোটেলে।

— অ্যাঁ! ও বুঝেছি। এখনো কোথাও চাকরি পাওনি তাহলে ?

— আপনারা দু' জনে মেদিনীপুর আর বাঁকুড়ায় চলে যাচ্ছেন কেন ?

পৃথিবীটা যদি বদলাতে নাও পারি, তবু দেখা যাক অন্তত কয়েকটা গ্রামকে বদলানো যায় কি না!

— আপনারা গ্রামে গিয়ে থাকবেন ?

— তাই তো ঠিক করেছি। আমাদের পার্টি থেকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে অনেক দিন থেকেই কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু গ্রামের চাষীদের কাছে আমরা পৌঁছোতেই পারিনি। চাষীরা জানেই না এ দেশের কাছ থেকে তারা কতটুকু পেতে পারে।

— নিখিলদা, আমায় নিয়ে যাবেন ?

— তুমি যাবে ?

— হ্যাঁ।

— তুমি মাটির ঘরে থাকতে পারবে ? যে গ্রামে আমি যাচ্ছি, সেখানে দু–তিনবার আমি ঘুরে এসেছি, একটা পাকা বাড়ি নেই, স্কুল নেই।

— তা হোক। আমি ঠিক থাকতে পারবো।

— বড় বড় সাপ, তোমার সাপের ভয় নেই ?

— না, নিখিলদা।

— কিন্তু আমরা যে কালকেই রওনা হচ্ছি।

— আমি রেডি, আমার তো কোনো বন্ধন নেই!

— বাড়ির জন্য মন কেমন করবে না ?

— নিখিলদা, আপনি কি আমায় ছেলেমানুষ পেয়েছেন ?

সুদীপাদি বললেন, নীলু বরং আমার গ্রামে চলুক। ওকে খুব করে খাটাবো।

আমি মুগ্ধভাবে সুদীপাদির দিকে তাকালুম। ষোলো বছর বয়সে যেদিন সুদীপাদিকে প্রথম দেখি, সেদিনই দারুনভাবে ওঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলুম। সুদীপাদি আমার চেয়ে চার–পাঁচ বছরের বড়, এমন রূপসী ও তেজস্বিনী নারী আমি আর একজনও দেখিনি। আমরা থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যেদিন টিয়ার গ্যাস আর গুলি চললো, সেদিন দেখেছিলুম বটে সুদীপাদির সাহস। টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া অগ্রাহ্য করে সুদীপাদি ছুটে গিয়ে এক পুলিস অফিসারের গালে মেরেছিলেন টেনে এক থাপ্পড়!

সেই প্রেম এখনো যায়নি, এখনো আমি সুদীপাদির ক্রীতদাস। সুদীপাদি যদি অনুগ্রহ করে একবার আমাকে আলিঙ্গন দিতে রাজী হন, তাহলে তার বিনিময়ে আমি হাসতে হাসতে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি।

— না, সুদীপাদি, আমি আপনার সঙ্গে যাবো না।

— কেন ?

— আমি নিখিলদার সঙ্গে গিয়ে প্রথম কিছুদিন কাজ শিখে নেবো, তারপর আমি নিজেই একা অন্য কোনো গ্রামে গিয়ে কাজ করবো।

— নিখিল কাজ শেখাতে পারে, আর আমি তোমায় কাজ শেখাতে পারবো না ?

··আমি মানে··আমি মেয়েদের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারি না— ।

সুদীপাদি রেগে উঠে বললেন, কী, তুমি মনে করো ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা····।

নিখিলদা হো-হো করে হাসতে লাগলেন আর সুদীপাদি আমায় মারতে এলেন চড়। আমি কুঁকড়ে সরে গিয়ে কৃত্রিম ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, মারবেন না,মারবেন না, আপনার ঐ পুলিস-ঘায়েল করা চড় খেলে আমি মরেই যাবো একেবারে।

তারপর বললুম, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, নিখিলদা। আপনারা দু'জনেই এক গ্রামে যাচ্ছেন না কেন ?

—দু'জনে এক সঙ্গে যদি যাই, এক সঙ্গে থাকি, তার মানেই তো সেখানে আবার একটা সংসার পাতার ব্যাপার। তখন আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যাই অনেক সময় বড় হয়ে উঠবে!

সুদীপাদি বললেন, আমি আর কোনোদিন সংসার করতে চাই না।

—নীলু, তুমি সত্যিই যেতে চাও।

—নিশ্চয়ই।

—তা হলে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে চলে এসো কাল সকালে।

—আমি একেবারে তৈরি, যদি বলেন তো এই মুহূর্তে চলে যেতে পারি····।

—নিখিলদার ঘরের দরজা খোলা, থপ্ থপ্ করে হামাগুড়ি দিচ্ছে একটা বাচ্ছা। ঘরের মেঝেতে এক রাশ মুড়ি ছড়ানো, বাচ্চাটা তাই খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। নিখিলদার নাম ধরে ডাকতে অন্য একটা লোক বেরিয়ে এলো! নিখিলদা এখানে থাকেন না ?

সেই লোকটি নিখিলদার পিসতুতো দাদা হন। তাঁর কাছ থেকে কয়েকটি কথা জানতে পারলুম। নিখিলদা মাস চারেক ধরে জেলে। সুদীপাদি কী একটা স্কলারশীপ পেয়ে রিসার্চ করতে গেছেন চেকোশ্লোভাকিয়ায়। তারপরই নিখিলদা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের স্ট্রাইকে মারামারির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে গ্রেফতার হন। কবে ছাড়া পাবেন ঠিক নেই।

কেন সব জিনিস এমনভাবে ভেঙে যায় ?

—তুমি ভাই নিখিলকে খুঁজছো কেন? খুব কি কোনো দরকার ছিল ?

কী বলবো আমি নিখিলদার পিসতুতো দাদাকে ? নিখিলদার ওপর যে আমার সবকিছু নির্ভর করছিল। সুদীপাদি বিদেশে ? চোকোশ্লোভাকিয়ার গ্রাম বদলাতে গেছেন!

—এই রোদ্দুরে হেঁটে এসেছো, তুমি ভাই ভেতরে এসে একটু বসবে ?

ঘরের ভেতরটা একবার উঁকি মেরে দেখলুম। একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর খুব রোগা একজন মহিলা চোখে চশমা পরে কী যেন সেলাই করছেন। তাঁর পাশে অনেকগুলো ছেঁড়া জামা-কাপড়! সব কিছুর মধ্যে একটা নোংরা নোংরা ভাব। সুদীপাদি বোধ হয় কোনো দিন এ বাড়িতে থাকেননি। কে জানে, শেষ পর্যন্ত নিখিলদার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল কি না।

নিখিলদার বাড়ি ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম রাস্তার মোড়ে। তা হলে আমার গ্রামে যাওয়া হলো না ? মনে মনে সব যে ঠিকঠাক করে ফেলেছিলুম! এর পর সারা দিনটাই ব্যর্থ মনে হয়।

গিনেস বুক অব রেকর্ডসে অনেক ভুল লেখে!

।। সাত ।।

একটু দেরি হলো আমার আসতে, পিয়া বাবুজী দু'জনেই খুব লক্ষ্মী ছেলে-মেয়ের মতন পড়তে বসে গেছে। আমার চেয়ারটিতে বসে আছে অন্য একটি মেয়ে।

আমি ঘরে ঢুকতেই পিয়া বললো, এই বাবুজী আর একটা চেয়ার নিয়ায় না, প্লীজ!

বাবুজী সঙ্গে সঙ্গে বললো,সরি, আই অ্যাম বিজি, তুমি নিজে নিয়ে এসা— ।

অন্য মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আই মাস্ট পুশ অফ্ নাও।

পিয়া বললো, না, না, পারমিতা, তুই একটু বোস্ না।

একটু আগে আমি বন্ধুদের সঙ্গে দারুণ আড্ডা দিয়ে এসেছি।

তখন আমার চেহারা ছিল অন্য রকম। এ বাড়িতে পা দিলেই আমি বদলে যাই, এখন আমি মাস্টার, মুখে ঈষৎ গাম্ভীর্য মাখানো, আমার নিছক গোমড়া–মুখো যাতে না মনে করে সেই জন্য ঠোঁটে খুব সামান্য হাসির ছায়া ইংরেজিতে যাকে বলে গোস্ট অব দা স্মাইল!

পিয়া বললো, মাস্টারমশাই, এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এই আমার বন্ধু পারমিতা। এর কথা কতবার বলেছি আপনাকে—

মেয়েটি আমার দিকে পুরোপুরি না ফিরে হাত তুলে বললো, নমস্কার।

তারপরই বললো, আমি এবার যাই, মা উইল বি ওয়েটিং ফর মী।

—তুই আর একটু বোস।

—য়ু নো ভেরি ওয়েল, আমার ফিরতে একটু দেরি হলে মা কীরকম অ্যাংকসাস্ হয়ে যান—

পিয়া এগিয়ে দিতে গেল মেয়েটিকে। আমি বাবুজীকে পড়াতে শুরু করলুম, বাবুজী এমনিতে ছটফটে, কিন্তু যেটুকু সময় পড়ে, তখন গভীর মনোযোগ দেয়। বাবুজী ঠিকই করে রেখেছে, ও এঞ্জিনিয়ার হবে।

একটু বাদে পিয়া এসে এক গাল হাসি মুখ করে বললো, মাস্টারমশাই, আপনাকে পারমিতার খুব পছন্দ হয়েছে!

আমি হাঁ! আমাকে পছন্দ হয়েছে মানে ? কয়েক পলক মাত্র দেখেছি মেয়েটিকে। একটিও কথা বিনিময় হয়নি।

পিয়ার ভাষাই এই রকম।

আমি ভুরু তুলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

পিয়া বললো, হ্যাঁ সত্যি ওর পছন্দ হয়েছে আপনাকে। ও বললো, হি ডাজ্ ন্'ট লুক লাইফ আ টিপিক্যাল টিউটর।

— বেশ বুঝলুম। আমাকে ওর পছন্দ হয়েছে। তাতে কী হবে ?

—আপনি ওকে পড়াবেন কাল থেকে।

—আমি পড়াবো ? কেন!

— বাঃ, আপনি পড়াবেন না ? আমার বন্ধুকে আপনি পড়াবেন না ?

— বাঃ আমার সময় থাকলে তবে তো— ।

—আপনি পড়াবেন না ? আমি ওকে কথা দিলাম।

পিয়ার স্বভাবই এই যে ও নিজে মনে মনে যা ঠিক করে, তার কোনো প্রতিবাদ পছন্দ করে না। ওর সরল আন্তরিকতা দিয়ে ও পৃথিবীর সবাইকে নিজের মতন মনে করে। আমি উৎসাহ না দেখাতে ওর চোখ ছলছল করে উঠলো।

— কী ব্যাপার, আমি কিছুই জানি না — ।

— বাংলা কম্পালসারি হয়ে গেছে, সেকেণ্ড ল্যাঙ্গোয়েজ নিতেই হবে, ও বাংলা ভালো জানে না।

বাবুজী পাশ থেকে মন্তব্য করলো, ভালো জানে না মানে ? বুঝলেন মাস্‌শাই, ওর তুলনায় আই অ্যাম আ বেঙ্গলি স্কলার। শী ডাজ্‌ নট ইভ্‌ন নো হাই টু রাইট অ আ ক খ!

পিয়া বললো, ইউ শাট্‌ আপ।

ফরাসী কায়দায় কাঁধ শ্রাগ্‌ করলো বাবুজী।

পিয়া আবার বললো, শুনুন মাস্টারমশাই, পারমিতা বাংলা জানে···কিন্তু লেখার অভ্যেস তো নেই··· পরীক্ষা যখন দিতেই হবে তাই আমি ওকে বলেছি আমার মাস্টারমশাই তোকে এই কয়েক মাস পড়িয়ে দিলেই তুই পাস করে যাবি—।

বাবুজী বললো, মাস্‌শাই, ডোন্‌ট টেক দ্যাট রিস্ক।

আবার পিয়া বললো, ইউ শাট্‌ আপ। আবার বাবুজীর কাঁধ শ্রাগ্‌।

পিয়া আমাকে বললো, এখন মাস্টারমশাই, আপনি যদি ওকে পড়াতে না চান তাহলে আমি··· আত্মহত্যা করবো। আমার কথার কী দাম থাকবে ?

—সেই জন্য বুঝি ঐ মেয়েটি আমাকে দেখে পছন্দ করতে এসেছিল ?

এবার আবার পিয়ার মুখে হাসি ছড়িয়ে গেল। চুপি চুপি গোপন কথার ভঙ্গিতে বললো, পারমিতার ধারণা কি জানেন, প্রাইভেট টিউটর মানেই বুড়ো নিকেলের চশমা-পরা, চোখে পিচুটি, নস্যি নেয়—হি-হি-হি-হি।

বাবুজী বললো, শী ডিজার্ভস আ টিউটর লাইফ দ্যাট।

—ইউ শাট্‌ আপ! আপনি ওকে পড়াবেন না মাস্টারমশাই?

—দেখি, যদি সময় করা যায়।

—মা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

—এখন তুমি পড়ায় মন দাও তো, অনেক গল্প হয়েছে···

বাবুজী আগে শেষ করে উঠে গেল। পিয়া তারপরেও কিছুক্ষণ আমার ডিকটেশানে একটা প্রশ্নের উত্তর লিখছিল, হঠাৎ লেখা থামিয়ে আবার চোখ-মুখে গোপন কথা বলার ভঙ্গি করলো।

—মাস্টারমশাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ? কারুকে বলবেন না বলুন ?

—বুঝেছি, প্রমিস করতে হবে তো ? করলুম!

—আপনি গল্প লেখেন ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাভ নেই আর। পিয়ার গোপন কথাগুলো এরকমই অদ্ভুত হয় বটে ?

—না তো! কে বললো তোমাকে ?

—হ্যাঁ লেখেন, মা বলেছে।

ছিল কবিতা, হয়ে গেল গল্প। প্রতিবাদ করেও কোনো ফল হবে না।

—শুনুন মাস্টারমশাই আপনি এর পরের যে গল্পটা লিখবেন, তার হীরোর নামটা আমি ঠিক করে রেখেছি। আপনাকে নিতেই হবে সেই নামটা। খুব সুন্দর, মিষ্টি একটা গল্প লিখবেন। হীরোর নাম দেবেন অভিজিৎ।

—বেশ দেবো। তার চেহারা কী রকম হবে ?

—খুব হ্যাণ্ডসাম! এক্সট্রা অর্ডিনারি! তা বলে বিচ্ছিরি ফর্সা আর কোঁকড়া চুল বানাবেন না যেন! গায়ের রং ফর্সা আর কালোর মাঝামাঝি।

—স্বাস্থ্য খুব ভালো ? লম্বা ?

—হ্যাঁ স্বাস্থ্য খুব ভালো, কিন্তু ঐ যে এক্সারসাইজ করা গায়ে কেঁচোর মতন মাস্‌ল, সেইরকম চেহারা আমার খুব খারাপ লাগে। আপনার হীরো হবে লম্বা ল্যাংকি ধরনের, চোখদুটো খুব গম্ভীর, আর হাসে যখন-তখন, চমৎকার গলার আওয়াজ, সিগারেট খায় না…

এবার সব ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। পিয়ার মুখখানি স্বপ্ন মাখা। অভিজিৎ ওর স্বপ্নের রাজকুমার।

—এই অভিজিৎরা ব্রাহ্ম, তাই না ?

—অ্যাঁ ? আপনি কী করে জানলেন?

এমন অবাক বোধ হয় পিয়া জীবনে কখনো হয়নি। চোখ দুটি টলটল করছে।

—ওদের বাড়িতে সবাই খুব ভগবানকে বিশ্বাস করে।

—আপনি কী করে জানলেন ? না, না অভিজিৎ নামে কেউ নেই, আপনাকে বানিয়ে লিখতে বলেছি।

আমার মনে পড়লো পিয়ার বাবা একদিন বলেছিলেন, ভগবান আছেন কি নেই তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি…।

—ঠিক আছে, তা হলে ঐ অভিজিৎকে নিয়ে লিখবো একটা গল্প, আর সেই গল্পের হিরোইনের নাম হবে পিয়া।

—না, না, আমি মোটেই সে কথা বলিনি, খবর্দার লিখবে না মাস্টারমশাই, ভালো হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি, তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো—।

হাসতে হাসতে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

সুনেত্রাদেবী এসে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার ? কী হয়েছে ?

—কিচ্ছু না। এমনি আমি পিয়াকে একটু রাগাচ্ছিলুম।

—শুনুন, মাস্টারমশাই, পারমিতার মা টেলিফোন করেছিলেন, খুব করে অনুরোধ করছেন যদি আপনি পারমিতাকেও একটু পড়িয়ে দেন সপ্তাহে দু-তিনদিন… ওদের বাড়িতে যাকে তাকে পাঠানো যায় না, সে আপনি গেলেই বুঝবেন…।

ভাবনীপুরের টিউশানিটা ছাড়বার পর আমার তো আর একটা দরকারই ছিল, সুতরাং আপত্তি করবো কেন!

বেরুবার সময় দোতালার সিঁড়ির মুখে এক ভদ্রলোককে দেখে আমি থমকে গেলুম। সেই জ্ঞানব্রত রায়চৌধুরী, গোপালপুরে এঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এবার সব ফাঁস হয়ে যাবে। এবার আর উপায় নেই। গোপালপুরে যাবার কথা আমি এ বাড়িতে ঘুণাক্ষরেও জানাইনি। তখন আমার পা ভেঙে বিছানায় শুয়ে থাকার কথা।

জ্ঞানব্রতবাবু আমার দিকে কয়েক পলক তাকালেন শুধু, তারপর কোনো কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে এলন ভেতরে। আমি তরতর করে নেমে গেলুম সিঁড়ি দিয়ে, তারপর এক দৌড়ে রাস্তায়।

জ্ঞানব্রতবাবু আমায় চিনতে পারেননি ? মাত্র একমাস আগে দেখা, আমার মনে আছে, অথচ ওঁর মনে নেই? কিংবা উনি অতিশয় ভদ্রলোক। আমার মুখে-চোখে আড়ষ্ট ভাব কিংবা ভয়ের চিহ্ন দেখেই সব ব্যাপারটা বুঝে গেছেন! কে জানে!

পরদিন গেলুম পারমিতাদের বাড়ি। ঠিকানা খুঁজে পাবার কোনো অসুবিধেই নেই, মিডল্‌টন রো-তে একেবারে সাহেব পাড়ায় ফ্ল্যাট। এখনো-এদিকে কিছু কিছু খাঁটি সাহেব আছে।

প্রথম অভ্যর্থনাটিই চমকপ্রদ।

বেল বাজাবার পর দরজাটা একটুখানি ফাঁক হলো। ভেতরে চেন বাঁধা। একজন মাঝবয়সী বিধবা মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, কে ? আমি পরিচয় দিতেই তিনি পুরোপুরি দরজাটা খুলে বললেন, ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেতরে আসুন।

ঘরের মধ্যে পা দেওয়ামাত্রই একটা বাঘ লাফিয়ে পড়লো আমার ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমি মাকে বলে কুপোকাৎ!

হ্যাঁ, প্রথমে বাঘ বলেই মনে হয়েছিল। তবে সেটাকে ঠিক কুকুরও বলা যায় না। সাক্ষাৎ নেকড়ের বংশধর। তার গর্জনেই আমার অজ্ঞান হয়ে যাবার কথা, তার ওপর আবার বুকে থাবা তুলেছে।

বিধবা মহিলাটি, নো— ও-ও! কাম হিয়ার, বলতেই কুকুরটি আমায় ছেড়ে চলে গেল। কামড়ায়নি অবশ্য, কিন্তু আমার বুকের মধ্যে যা যাচ্ছেতাই ব্যাপার হচ্ছে, তাতে আর কথা বলার শক্তি নেই। তক্ষুণি ঠিক করে ফেলেছি এ বাড়িতে আমি কিছুতেই পড়াবো না।

মহিলাটির পরনে ধপধপে সাদা শাড়ি, গায়ে কোনো অলঙ্কার নেই, তবু চেহারায় খুব আভিজাত্যের ছাপ। গায়ের রং দুধে-আলতায় মেশানো ? এরকম চেহারার মহিলাকে যেন সাহেব পাড়ার ফ্ল্যাটে ঠিক মানায় না।

—আপনি বসুন, বসুন। ইস্‌, আপনার লাগেনি তো ? আমারই দোষ, আমি আগে ডগিকে কিছু বলে দিইনি।

— ওকে বাঁধবেন না ?

— না, না, ওকে বাঁধতে হয় না, জীবনে কোনোদিনই ও বাঁধা থাকেনি। আপনি বুঝি খুব কুকুরে ভয় পান ?

বাঘের মতন কুকুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, এখানে ভয় পাওয়া-না পাওয়ার প্রশ্ন আসে কী করে?

— ডগি কিন্তু এমনিতে খুব শান্ত।

এসব কথাও আমি আগে অনেকবার শুনেছি। কুকুরের মালিক কখনো নিজের কুকুরের দোষ দেখতে পায় না। এদিকে কুকুরটা এখনো ওঁর পায়ের কাছে বসে আমার দিকে কুটিল চোখে চেয়ে আছে।

ভদ্রমহিলা এবার কুকুরটার দিকে ফিরে চোস্ত ইংরেজিতে খানিকক্ষণ ধরে বোঝালেন যে আমি শত্রু নই, এখন থেকে আমি প্রায়ই আসবো, ও যেন আমার সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলের মতন ব্যবহার করে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, দেখবেন, এরপর থেকে ও আর আপনাকে কোনোদিন কিছু বলবে না। আপনার মনে হবে এমন শান্ত কুকুর আপনি কখনো দেখেন নি। ওর গায়ে হাত দিন!

— না, না, তার দরকার নেই।

— দিন না! একবার দিয়ে দেখুন!

— না, না, হাত দিতে হবে না, মানে আমি বুঝতে পেরেছি।

— একবার হাত দিন নইলে ও ভাববে আপনি এখনো ভয় পাচ্ছেন —।

আমি রাজি হলেও আমার হাত যে বিদ্রোহ করছে। হাত উঠতেই চাইছে না। সত্যি কথা বলতে কি নিজের আঙুলগুলোর ওপর আমার একটু একটু মায়া আছে, কুকুরটা যদি কচাৎ করে কয়েকটা আঙুল কেটে নেয়···।

ভদ্রমহিলার পীড়াপীড়িতে আমাকে কুকুরটার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেই হলো। কুকুরটি এবার আমাকে অগ্রাহ্য করে উঠে চলে গেল দরজার কাছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, সবসময় ও ঐখানে বসে থাকে। আমাদের বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই তো, তা ওই আমাদের বডি গার্ড। আপনি কী খাবেন, চা না শরবত ? একটু শরবত বানিয়ে দি ? রোদ্দুরের মধ্যে দিয়ে এসেছেন ···।

ক্রমশ জানতে পারলুম, এই ভদ্রমহিলার স্বামী কোনো এক বিশাল চাকরি করতেন, হঠাৎ মারা গেছেন। পুত্রসন্তান নেই, তিন মেয়েকে নিয়ে তিনি এখানে থাকেন আর ঐ কুকুর। ওঁরা বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়েছেন বাংলার বাইরে, মেয়ে তিনটিই বরাবর কনভেন্টে পড়েছে, তাই বাংলা শেখার সুযোগ পায়নি। এ বাড়িতে একটাও বাংলা বই নেই।

ভদ্রমহিলা নিজে খুব ভালো বাংলা বলেন, খুব সুন্দর স্নেহপূর্ণ মা মা ব্যবহার। কথায় কথায় উনি জানালেন যে ওঁর শ্বশুর ছিলেন সংস্কৃতে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তারপর হেসে বললেন, আমার বাবাও খুব ভালো সংস্কৃত জানতেন, আমার নাম কী জানেন ? অপালা ? অনেকে এই নামের মানেই বুঝতে পারে না।

মেয়েরা বাড়িতে স্কার্ট পরে। বড় মেয়েটি এবার ইংলিশে এম. এ. পরীক্ষা দেবে, পারমিতা মেজো, আর ছোট মেয়েটি দূরে একটা সোফায় শুয়ে একমনে একটা বই পড়ছে। তিনটি মেয়ে যেন তিন বয়েসী তিনটি মেম।

— এই যাঃ! আমিই শুধু গল্প করে যাচ্ছি আপনার সঙ্গে, পারমিতা পড়বে না? চলুন, আপনাকে পড়বার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি···তবে আমার সঙ্গেও মাঝে মাঝে আপনাকে গল্প করতে হবে কিন্তু···।

বড় একটি হলঘরের দু'দিকে দু'রকম সোফা সেটি সাজানো। একপাশে একটি মস্ত বড় গান-বাজনার যন্ত্র, তার কাছে ছড়ানো রয়েছে রাশি রাশি বিলিতি রেকর্ড। হলঘরের শেষ প্রান্তে একটি পিয়ানো, তার পাশে জানালা দিয়ে উঁকি মারছে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ডাল।

পাশে একটা ছোট ঘরে পড়বার ব্যবস্থা খুব ছিমছাম পাতলা চেয়ার টেবিল।

পারমিতা মেয়েটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং তেজী। মুখে একটু রাগ রাগ ভাব। এই বয়সেই সে ইংরেজি সাহিত্যের অনেক বই পড়ে ফেলেছে, তার নিজস্ব মতামত গড়ে উঠেছে, অথচ তাকে জোর করে এখন এলিমেন্টারি বাংলা শিখতে হবে, এটা সে কিছুতেই পছন্দ করতে পারছে না। আমরাও মনে হলো, সত্যিই তো কী অন্যায়! বাঙালী হলেই যে সকলকে বাংলা পড়তে হবে, এর কী মানে আছে ? পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। সব মানুষের যোগাযোগের জন্য দরকার একটি ভাষা, সে ভাষা ইংরেজি ছাড়া আর কী হতে পারে ? আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে এ পৃথিবীর সব পুরুষ মানুষই প্যান্ট-শার্ট পরবে, আর বর্ধিষ্ণু চাষীরাও ইংরেজি বলবে।

বাংলা ভাষায় কেন হ্রস্বই দীর্ঘঈ আর হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ-র মতন বিচ্ছিরি কম্‌প্লিকেশানস আছে, তা নিয়ে পারমিতা প্রথমেই খুব অভিযোগ জানালো আমার কাছে। যেন আমিই এ জন্য দায়ী! আমি খুব সঙ্কুচিতভাবে বললুম, একবার কষ্ট করে শিখে গেলে তারপর আর খুব শক্ত লাগে না—।

—বাট এক্সপ্লেইন টু মী, হোয়াই দিজ আর নেসেসারি ?

—এক একটা ভাষার এক একরকম গড়ন— যেমন ফ্রেঞ্চ ভাষার বানান প্রথম প্রথম খুব শক্ত লাগে শুনেছি!

দরজার কাছে কেউ যেন জোরে জোরো কথা বলছে, পারমিতা এক্সকিউজ মী ফর আ মিনিট বলে উঠে চলে গেল। কোনো হকার বা ফেরিওয়ালা হবে বোধ হয়। এরকমভাবে দু-তিনবার উঠতে হলো পারমিতাকে। একবার ওর ছোটবোন নিয়ে এলো চেক বই, পারমিতা সই করে দিল তার এক পাতায়। বুঝতে পারা যায়, পারমিতাই এই পরিবারের সবদিক সামলায়। এইটুকু মেয়ের ওপর এত দায়িত্ব!

অনেক চেষ্টা করে শেষদিকে একবার মাত্র হাসাতে পারলুম পারমিতাকে। খাবার জল আর জলখাবারের পার্থক্য বুঝিয়ে। তখন বুঝতে পারলুম যতই গম্ভীর আর রাগী রাগী ভাব করুক, মেয়েটি আসলে সরল আর হাসলে ওকে ভারী সুন্দর দেখায়।

পড়াবার শেষদিকে শুনতে পাচ্ছিলুম পিয়ানোর আওয়াজ। কে বাজাচ্ছে জানি না, খুবই যেন করুণ সুর। শুনতে শুনতে মনটা আনমনা হয়ে যায়। যাবার সময় ঐ হলঘরটার মধ্য দিয়েই যেতে হবে, দেখলুম পিয়ানো বাজাচ্ছেন অপালাদেবী। অবিকল বাঙালী ঘরের মধ্যবয়সী বিধবা, তাঁর হাতে কী চমৎকার পিয়ানোর ঝঙ্কার। কোনো কথা না বলে তিনি আমার দিকে একবার চোখ তুলে তাকালেন।

মনে হলো, তাঁর দু' চোখে জল। উনি বাজাতে বাজাতে কাঁদছেন কেন ? কিন্তু সত্যি সত্যি আমি জলের রেখাই তো দেখেছি ওঁর চোখের নিচে। কারুকে একা নিঃশব্দে কাঁদতে দেখলে সবারই বুক মুচড়ে ওঠে।

এক একটা নতুন টিউশানির বাড়িতে আসি, আর নতুন নতুন মানুষ দেখি। সবাই আলাদা। প্রত্যেকটি বাড়িরই কোনো না কোনো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকটি সংসারই এক একটা উপন্যাসের মতন। অন্যরকম চরিত্র, অন্যরকম কাহিনী। এ পর্যন্ত আমার কম তো দেখা হলো না!

।। আট ।।

কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ এক একদিন মনে হয় আত্মহত্যা করলে কেমন হয় ? বেশ টুপুস করে মরে যাবো, কেউ জানতেও পারবে না। মৃত্যুর ওপারে একটা দেশ আছে, অচেনা রহস্যময়, সেখানে শুরু হবে নতুন জীবন। সেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, টাকা-পয়সা নেই, আর সেইজন্যই সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের বঞ্চনার কিংবা শোষণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

অবশ্য, মৃত্যুর ওপারের দেশটির চেয়েও বেশি আগ্রহ থেকে যায় এই ফেলে যাওয়া জীবনটি সম্পর্কে। আমি মরে গেলেও কেউ কি আমায় মনে রাখবে ? মা-বাবা দুঃখ পাবেন, সে তো জানা কথাই, তা ছাড়া আর কারুর মনে কি একটুও জায়গা থাকবে আমার জন্য ? খুব দেখতে ইচ্ছে করে। মৃত্যুর পর কায়াহীন অদৃশ্য হয়ে ফিরে আসবো বন্ধুদের

পাশে, নিঃশব্দে দাঁড়াবো, আর রাণীর কাছে, নিরালা ঘরে রাণীর একেবারে সামনে, ও জানতেও পারবে না, আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকবো, বুঝতে পারবো ওর দীর্ঘশ্বাসের ভাষা···যদি দীর্ঘশ্বাস ফেলে! আর যদি দেখি, আমি একেবারে মুছে গেছি ? মুছে যাবারই মতন, মানুষ তো আমি, কী করেছি এই একুশ বছরের জীবনে যে অন্যরা মনে রাখবে ?

আরও কম বয়েসে খুব ইচ্ছে হতো বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতো। কোথায় যাবো ঠিক নেই, যে কোনো নিরুদ্দেশে। তখন অন্য কোনো চিন্তা ছিল না, পাহাড় বা অরণ্য বা সমুদ্রের ধারে আমার কাল্পনিক কুটিরে আমার বাড়ি থেকে পালানো জীবনের পরম সুখের ছবি দেখতুম। কলেজ-জীবন শেষ করার পর কঠোর বাস্তবকে চিনতে শিখেছি ; বাড়ি ছেড়ে বিনা উদ্দেশ্যে চলে গেলে যেখানেই যাবো, সেখানেই কোনো না কোনো উপায়ে টাকা-পয়সা রোজগার করতে হবে। নইলে এ পৃথিবী টিকতে দেবে না। শুধু বনের ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকার মতন বন আর অবশিষ্ট নেই কোথাও। কেন নেই ? মানুষ আর স্বাধীন নয় কেন ?

শৈশব বয়েস পার হবার পর যেদিন প্রথম আমরা টাকা-পয়সার হিসেবটা বুঝতে শিখি সেইদিন থেকেই স্বর্গের সঙ্গে আমাদের যোগোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দুপুরবেলা কিছুতেই বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। গোটা পাড়া জুড়ে এখন মেয়ে-মহল, আমিই যেন একমাত্র পুরুষ। এই চিন্তাটার জন্যই দুপুরবেলা বিছানাটাও আমার কাছে মনে হয় শরশয্যা। একটা চাকরির ইন্টারভিউয়ের নাম করে মায়ের কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

যাওয়ার সময় উৎসুকভাবে নাড়াচাড়া করে গেলুম লেটার বক্সটা। আমার নামে কোনো চিঠি আসার সম্ভাবনা নেই। বাবা মাঝে মাঝে বলেন আজকের কাগজ দেখেছিস ? একটা ভালো পোস্টের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে। অ্যাপ্লাই করে দে না!

আমি তক্ষুণি রাজি হয়ে যাই। অনেক সময় দরখাস্ত লেখার ভান করি, পুরোনো টাইপ রাইটারটা নিয়ে খটাখট করি পর্যন্ত তবু আজ অবধি একটাও দরখাস্ত ডাকে দিইনি। এ দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলে কোনোক্রমে একটা চাকরি পাবার জন্য হন্যে হয়ে আছে, তাদের দলে যোগ দেবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। কলকাতা শহরে আমিই একমাত্র বেকার এবং গরীব বাড়ির ছেলে, যে কোনো চাকরি চায় না, শুধু এই অহঙ্কারটুকুই আমার মনকে চ্যাঙ্গা রাখে।

যে সব বন্ধুবান্ধবরা চাকরি পেয়েছে, তাদের অফিসে দুপুরবেলা দেখা করাটা ভালো দেখায় না। প্রথম প্রথম কয়েকবার গিয়েছিলাম। কিন্তু বন্ধুদের অন্যান্য সহকর্মীদের তাকানো দেখে মনে হয়, তারা ভাবছে, এই বেকার ছেলেটা রোজ দুপুরে বন্ধুকে জক্ দিয়ে টিফিন খেতে আসে।

তবু কোথাও তো যেতে হবে! একা একা সিনেমায় যাওয়া যায় না। একা কফি হাউসে গিয়ে বসলে অন্য টেবিলের ছেলেমেয়েরা, এমনকি বেয়ারারাও মনে করবে, এইরে এ ছেলেটাকে সবাই ত্যাগ করেছে নিশ্চয়ই। অন্যদিন দেখেছি, চৌদ্দ-পনেরো জনের সঙ্গে মিলে গলা ফাটায় আজ সে মক্কেল একা ভিজে বেড়ালটি হয়ে বসে আছে কেন ?

তিন-চারমাস উৎপলের অফিসে যাইনি, আজ যাওয়া যেতে পারে একবার। একজন কারুকে সঙ্গে পেলে গ্লানি কেটে যায়, তখন দু'জনে মিলে অন্যদের অফিস-টফিসে হানা দেওয়া খুবই সহজ।

উৎপলের চেয়ার খালি, ওর পাশের টেবিলে বসে পরমেশ নামে একজন, তার সঙ্গেও আমার মুখ চেনা। আমাকে দেখেই পরমেশ বললো, উৎপলবাবু তো রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গেছেন, কখন ফিরবেন বলা যায় না। আপনি আপনার বন্ধুর গুডনিউজ শোনেন নি ?

—গুড নিউজ?

—হ্যাঁ। কোম্পানী তো উৎপলবাবুকে বিলেত পাঠাচ্ছে?

—তাই নাকি ? বাঃ

—অবশ্য উনি চিঠিটা কালই পেয়েছেন, যেতে হবে খুব শিগগিরই···সেইজন্য পাসপোর্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনেক ঝামেলা।

—দারুণ ব্যাপার! উৎপল আমাদের আগে কিছুই জানায়নি।

—ঐ যে বললুম, কালকেই পাকা চিঠি পেয়েছেন।

আমার আপত্তি সত্ত্বেও পরমেশবাবু আমায় চা না খাইয়ে ছাড়লেন না।

আমার ইচ্ছে করছিল, এক্ষুণি উৎপলকে খুঁজে বার করে দু'জনে মিলে খুব আনন্দ করি। আমাদের বন্ধুদের একজন বিলেত যাচ্ছে, এতো আমাদের সকলের মিলে যাওয়ার মতনই। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক–ট্যাঙ্কের নাম শুনলেই ভয় হয়। ওখানে কে খুঁজতে যাবে উৎপলকে!

আশু ভাস্কররা কি এ খবর জানে ? ওদের জানানোও কি আমার কর্তব্য নয় ? কিংবা, এমনও হতে পারে, ওদের প্রত্যেকের অফিসের ফোন আছে, সেই সূত্রে ওদের জানাজানি হয়ে গেছে। দু–দিন আমার সঙ্গে দেখা হয়নি বলে আমি ছন্নছাড়া।

মিশন রো থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম কলেজ স্ট্রীটে। আর কোথাও যাবার জায়গা না থাকলে এখানেই আসতে হয় ঘুরেফিরে। এটাই আমার নিজস্ব জায়গা । এখানকার প্রতিটি গাছ আমায় চেনে। কফি হাউসে না গিয়ে চলে গেলুম ইন্দ্রনাথের বইয়ের দোকানে। ইন্দ্রনাথও নেই, বেরিয়েছে, ঠিক নেই কখন ফিরবে। এক একদিন হয় এরকম যাকে যাকে খোঁজ করা হবে, তাদের কারুকেই পাওয়া যাবে না। সকালবেলা একজন অপমান করলে তারপর সারাদিন ধরেই কেউ না কেউ অপমান করে যাবে!

রাস্তায় নেমে এলুম আবার। এবার ?

একটি সিগারেট কিনে সন্তর্পণে ধরালুম। শেষ টান পর্যন্ত মৌজ বজায় রাখতে হবে।

সামনের মঙ্গলবার আমি বাইশ বছরে পা দিচ্ছি। পরের বছরটাও কি এরকম ভাবেই কাটবে ? তার পরের বছর ? নাঃ, তা হতেই পারে না। হঠাৎ একটা কিছু ঘটে যাবে। বৃষ্টি নামবার অনেক আগেই যেমন পিঁপড়েরা টের পেয়ে যায়, সেইরকমই আমি যেন সারা শরীর দিয়ে অনুভব করছি একটা বিরাট কিছু ঘটবে, একটা বিরাট কিছু।

উৎপল বিলেত যাচ্ছে, আর আমি! সারা পৃথিবীটা আমার দু'পায়ের ছোঁয়া পাবে না, তা কি হয় ? রাশিয়ার ভলগোগার্ড শহরে যে বিশাল নারী–মূর্তিটি, সে কি অপেক্ষা করে নেই আমার এক ঝলক দৃষ্টির জন্য ? প্যারিসে নেপোলিয়নের সমাধি ? রাইন নদীর দু'পাশের অরণ্য ? যাবো যাবো, ঠিকই যাবো, এত ব্যস্ততার কী আছে ? ···

—আজ কী বার ? শুক্রবার না ? আজ রাণীর অফ ডে, কাল শেষ পরীক্ষা। রবিবারই ওরা চলে যাবে মধুপুরে। এর মধ্যে রাণীর সঙ্গে আর দেখা হবে না ? একথা মনে আসামাত্র ছুটে গিয়ে উঠে পড়লুম চলন্ত ট্রামে।

প্রায় তিনটে বাজে। এখন ওদের বাড়িতে গিয়ে সুরঞ্জনকে ডাকা যায় না। রাণী নির্ঘাত পড়ার ঘরে আছে। ওদের বাড়ির সদর দরজা খোলা থাকে না। দরজায় বেল দিয়েই অন্য কেউ খুলবে, কিংবা ওপরে বারান্দা থেকে উঁকি মারবে। আমাকে দেখেই বলে দেবে, সুরঞ্জন বাড়ি নেই! আমি যদি বলি সুরঞ্জন নয়, আমি রাণীর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি তা হলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় ?…

…তবু আমি দরজার কাছে যাই না। পড়ার ঘরের ডান দিকের জানলাটা খোলা, তার পাশে একটা সরু গলি, সেখানে গিয়ে আমি জানলার শিক ধরে দাঁড়ালুম। যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই, দেয়ালের দিকে মুখ করে পড়ছে রাণী। গভীর মনোযোগের সময় ও একটু একটু দোলে, পিঠের ওপর এলো চুল, আগোছালো শাড়ি, টেবিলের ওপর এক গাদা বইখাতা ছড়ানো। শেষ পরীক্ষার আগের দিন রাণী যেন জীবন-মরণ পণ করে পড়ছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতেই আমার ভালো লাগলো। কোনো মানুষ যখন একা তন্ময় হয়ে থাকে, তখন তার আর একরকম রূপ খুলে যায়। আমি দেখলুম রাণী এক পায়ের পাতা ঘষছে অন্য পায়ে, বাঁ হাতের তালুতে চিবুক, ডান হাতে একটা খোলা কলম, রাণীর পিঠটা যে এত চওড়া তা তো আগে কখনো লক্ষ্য করিনি। কোমরটা অত সরু…এই মেয়েটি কি আমার ?

— রাণী।

— কে ?

প্রথমে চমকে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েই রাণীর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, সেখানে আর কোনো বিস্ময়ের ছাপ নেই। চেয়ে রইলো তো চেয়েই রইলো। আমারও পলক পড়ছে না। যেন আমরা স্ট্যাচু স্ট্যাচু খেলা খেলছি। কয়েক লক্ষ বছর পার হয়ে গেল এর মধ্যে! মধ্য এশিয়ার তৃণভূমিতে একজন মানুষ আর একজন মানুষীর দিকে এইভাবে প্রথম চেয়েছিল।

— তোমাকে একটু ডিসটার্ব করতে এলুম।

রাণী চেয়ারের পিঠের দিকে ফিরে বসলো। তারপর আস্তে আস্তে প্রতিটি শব্দের জোর দিয়ে বললো, তুমি যদি আজ না আসতে তাহলে জীবনে কোনদিন আর তোমার সঙ্গে কথা বলতুম না!

— আমি যে আসবো, তাতে তোমার কোনো সন্দেহ ছিল নাকি ?

— এর মধ্যে কেন একদিনও আসো নি ? জানো,তোমার জন্য আমার ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রির পেপারটা খারাপ হয়ে গেছে ?

— আমার জন্য ?

— নিশ্চয়। তোমার জন্যই তো। ঐ একটা বাজে ছেলের জন্য ভেবে ভেবে শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট, যদিও তার কিছুই আসে যায় না।

— তা তো বটেই ? আমি কারুর জন্য ভাবি না। কারুর জন্য আমার মন কেমন করে না।

— তোমার কত বন্ধুবান্ধব, সর্বক্ষণ আড্ডা, তুমি তো বেশ মজাতেই আছো!

— তোমরা এই রবিবারই মধুপুর যাচ্ছো তো ?

— হ্যাঁ।

— তোমরা কোন্ বাড়িতে উঠবে ? ধরো যদি আমি হঠাৎ মধুপুরে হাজির হয়ে যাই ? এমনিই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে।

— সে সাহস তোমার হবে না আমি জানি। তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? বাড়ির ভিতর এসো।

— কে দরজা খুলবে ?

— আমি।

— তারপর আমি তোমার ঘরে গিয়ে বসবো, কেউ যদি দেখে ফেলে কী ভাববে ? তোমার পরীক্ষার সময় দুপুরবেলা আমি তোমার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে তোমার সময় নষ্ট করছি।

— কে কী ভাববে এই চিন্তাতেই তোমার সবটা সময় কেটে যায়, তাই না ?

— তোমার কাকা কী রকম ভাবে যেন তাকান, আমার খুব লজ্জা করে।

— আমার কাকা কোনোদিন কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন না। আসবে কি না, বলো।

— না, যাক আজ থাক।

— তবে থাকো ঐখানে দাঁড়িয়ে।

— রাণী, একবারটি উঠে আমার কাছে এসো।

— কেন ?

— এমনিই!

— মোটেই না। তুমি বড্ড অসভ্য সেদিন তুমি কী করলে বলো তো? ইস্।

— না, ওসব কিছু করবো না। একবার শুধু কাছে এসো।

— কেন কাছে গেলে কী হবে…?

— শুধু তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেবো। শোনো শোনো, এমনি নয়, ছুঁয়ে দিলে কী হবে জানো তো, আমার ইচ্ছে শক্তিটা তোমার শরীরে চলে যাবে, দু'জনের ইচ্ছে শক্তি মিলিয়ে তোমার রেজাল্ট অনেক ভালো হবে।

রাণী কুলকুল করে হেসে ফেললো।

— তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ? ফ্রয়েড লিখেছেন এরকম হয়।

— ফ্রয়েড লিখেছেন না ছাই লিখেছেন! গুল চালাবার আর জায়গা পাওনি ?

— পরীক্ষা করে দেখো অন্তত। একবার পরীক্ষা করতে দোষ কী ?

— ওরকম রাস্তার ধারে জানালায় গিয়ে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। বলছি না ভেতরে এসো।

— তুমি যদি সায়েন্সের বদলে আর্টস পড়তে তাহলে তোমাকে আমি বেশ পড়াতে পারতুম পরীক্ষার আগে।

— তোমার কাছে পড়তে আমার বয়েই যেত।

— একবারটি কাছে আসবে না ?

যেন খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাণী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর জানালাটা থেকে দু' ফুট দূর পর্যন্ত এসে ডান হাতটা বাড়িয়ে বললো, এই যে, দাও, ছুঁয়ে দাও।

রাণীর হাতটা আলতোভাবে ছুঁয়ে আমি জপ করার ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। তারপরই একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিয়ে এলুম একেবারে জানালার

গরাদের ওপর। অন্য হাত দিয়ে ওর কোমর বেষ্টন করে আমি ওর ঘ্রাণ নিতে লাগলুম পাগলের মতন।

কয়েকটি মুহূর্তমাত্র, তার মধ্যেই রাণী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। আমি তো নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছি না, রাণীর সারা মুখে লালচে আভা।

— এই জন্যেই তোমাকে একদম বিশ্বাস করি না, অসভ্য কোথাকার ইস তুমি এমন···

— প্লীজ রাণী, কিছু মনে করো না, হঠাৎ কী রকম যেন মাথাটা খারাপ হয়ে গেল···

— তোমার তো সব সময়ই মাথা খারাপ।

— কিন্তু আমি আমার ইচ্ছে শক্তি তোমার শরীরে পাঠিয়ে দিয়েছি ঠিকই। তোমার এখন একটু অন্যরকম লাগছে না ?

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে রাণী আমার দিকে এমন অদ্ভুত চোখে তাকালো, যার আমি কোনো মানেই বুঝতে পারলুম না।

আসলে আমার চিন্তাশক্তিটাও অন্য দিকে প্রবল হয়ে উঠেছে। একটু স্ফুলিঙ্গ থেকেই দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। রাণীকে একবার ছোঁয়ার পর আমার সমস্ত, ইচ্ছা শক্তি চাইছে সর্বাঙ্গ দিয়ে ওকে আবার ছুঁতে। রাণী কতবার চিঠিতে লিখেছে, আমি তোমার, তাহলে ঐ ঠোঁট ঐ বুক, চাঁদের মতন নাভি কেন আমি ছুঁতে পারবো না ?

— রাণী, আর একবার কাছে এসো প্লীজ।

— এবার কিন্তু তোমায় মারবো বলে দিচ্ছি।

— আমি ভিক্ষে চাইছি।

— আমি ভিক্ষে দিই না।

— এই যে জানালার শিক, এ যেন জেলখানার গরাদ মনে হচ্ছে না ? যেন আমরা জেলের দুটো খুপরিতে বন্দী, কেউ কারুর কাছে আসতে পারবো না।

— আমি কেন বন্দী হবো ? আমি ইচ্ছে করলেই এ ঘর থেকে বেরুতে পারি। তুমিই শুধু আসতে পারো না।

— এখন আসবো ? দরজা খুলে দাও।

— না, থাক। আজ আর আসতে হবে না। এসে তুমি আবার অসভ্যতা করবে তো ? কাল আমার পরীক্ষা, সবকিছু গুলিয়ে দিতেই তোমার আনন্দ।

— রাণী, আজ এখনো আমার কাছে চাইলো না যে!

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রাণী হাত বাড়িয়ে বললো, দাও!

আমার কাছে তো সব সময়ই থাকে, পকেট থেকে বার করে দিলুম রাণীর জন্য চিঠি। সেটা একটু খুলে দেখে নিয়ে রাণী বললো, তুমি বুঝি ভেবেছো, আমার নেই ?

ফিরে গিয়ে টেবিলের দেরাজ খুলে একটা খাতার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে রাণী সেটা অনেকগুলো ভাঁজ করে ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। সেটা ঠিক সময় লুফে না নিলে রাস্তায় পড়ে যেত।

— এ রকম ভাবে চিঠি দিলে আমি নিই না।

— কী রকম ভাবে দিতে হবে মহারাজকে ?

— হাতে হাতে।

— ইস্‌। তোমাকে আবার আমি বিশ্বাস করি আর কি।

— কথায় বলে তুমি ভিখিরিকে পয়সা ছুঁড়ে দেবার মতন···আমি এক্ষণো এভাবে নিতে চাই না।

— বললুম যে, আমি কখনো ভিক্ষে দিই না। তুমি নিজের অধিকারে আমার ঘরে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে চাইতে পারো নি ? চিঠি নিতে না চাও, ফেরত দাও!

— রাণী, শোনো····

আর কোনো কথা বলা হলো না। একটা শব্দ হতেই আমি পেছন ফিরে তাকালুম।

গলির মুখে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে চারটে ছেলে। কোমরে হাত দেখলেই বোঝা যায় এরা কী ধরনের। যে ছেলেটি একটু বয়েসে বড়ো তার ঠোঁটে ডগলাসি গোঁফ, সে চোখটা বেঁকিয়ে গান ধরলো, যমু–না কি— তীর! আর একজন বললো, পৃথিবী আমারে চায় রেখো না বেঁধে আমার একটা হাত ধরে বললে, কোথায় মেরে যা না, আঁখিয়া মিলানা মিলানা···

বিদ্যুতের মতন চিন্তা তরঙ্গ বয়ে গেল আমার মাথায়। এদের সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলা বিপজ্জনক। এরা চ্যাঁচামেচি শুরু করবেই। রাণী শুধু শুনতে পেলেও ক্ষতি ছিল না, ওপরের বারান্দা থেকে ওদের বাড়ির কেউ উঁকি মারবে। তা হলেই কেলেঙ্কারির একশেষ।

সুরঞ্জন কিংবা ওর কাকার পাড়ার এই সব ছেলেরা ভয় পায়। আমাকেও মুখ চেনে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকিনি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি জানালার ধারে, সেই সুযোগটা নিয়েছে। কতক্ষণ ধরে ওরা আমাদের কথা শুনছে কে জানে আমি একেবারে খেয়ালই করি নি।

তক্ষুণি কোনো কথা না বলে আমি হনহন করে হাঁটতে লাগলুম উল্টো দিকে। ছেলেগুলো ধেয়ে এসে একজন প্রথমে আমার একটা হাত ধরে বললে, কোথায় যাচ্ছো, চাঁদু?

এক ঝট্‌কায় তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি ছুটলাম। ওরা আমাকে ধরে ফেলবেই জানি। ওদের কাছ থেকে নিস্তার নেই তবু রাণীদের বাড়ি থেকে যত দূরে চলে যাওয়া যায়। কোনো রকমে সারকুলার রোডে পৌঁছে গেলে অনেক লোকজনের মধ্যে ওরা বিশেষ কিছু করতে পারবে না।

সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীটের মাঝখানে ওরা ঘিরে ফেললো আমায়। একজন প্রথমেই আমার বাঁ হাতটা মুচড়ে নিয়ে গেল পিঠের দিকে। এ ছেলেটার খাঁটি গুণ্ডার মতন চেহারা । এর সঙ্গে গায়ের জোরে পারবো না।

আমার ডান হাতের মুঠোয় রাণীর চিঠি লুকোবার সুযোগ পায়নি।

— বেপাড়ায় এসে র‍্যালা হচ্ছে অ্যাঁ ?

— দুপুরবেলায় একেবারে বৃন্দাবন। হেভি লদকালদকি।

—আমাদের পাড়ায় ওরকম একটা বনেদী বাড়ি, সে বাড়ির মেয়েছেলের সঙ্গে কোথাকার একটা ফালতু।

— এমালটাকে আগেও কয়েকবার ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি না ?

— একেবারে বোবা মেরে গেলে কেন, চাঁদু ?

এদের সঙ্গে একটা কথাও বলে লাভ নেই বলে চোয়াল শক্ত করে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। তা ছাড়া, একটু মেজাজ দেখালেই এরা চারজনে মিলে আমার ওপর গায়ের জোর ফলাবে। তার চেয়ে ওরা যত ইচ্ছে বকে যাক।

— নাকে খৎ দেওয়া, যাতে আর কোনো দিন এ পাড়ায় ঢ্যামনামি করতে না আসে।

হারামীর বাচ্চাটা একেবারে মিটমিটে শয়তান, মুখখানা দ্যাখ, মুখখানা দ্যাখ—

— চিঠি, ওর হাতে চিঠিটা আছে।

— দেখি! ভালোচাও তো চিঠিখানা দাও! কাবলিদাকে দেখাবো।

সিদ্ধান্ত নিতে আমার এক মুহূর্তও সময় লাগলো না। চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলার উপায় নেই, পকেটে রাখলে কেড়ে নেবে, ছুঁড়ে ফেলে দিলেও তুলে নেবে।

ওরা কিছু বুঝবার আগেই আমি চিঠিখানা মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে শুরু করে দিলুম।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা চারজনে মিলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপরে। লাথি–ঘুঁষি–চড়। প্রতিরোধ করার উপায় নেই, দু'হাত দিয়ে আড়াল করে রইলুম মুখটা যাতে চোখে আঘাত না লাগে। একটুক্ষণের মধ্যেই পড়ে গেলুম মাটিতে।

— এই, এই আর ঝাড় দিস নি, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! মেরে ফেলবি নাকি।

অন্য একটা গলার আওয়াজ। তাকিয়ে দেখলুম বাঁ হাতে লোহার বালা পরা অন্য একটা বলশালী ছেলে। একে চিনি আমি, এর নাম সুবীর। ভদ্র পরিবারের বখা ছোকরা। এই সুবীর গত বছরেই রাণীর সঙ্গে ভাব করার খুব চেষ্টা করেছিল, দু–একদিন বাড়িতেও গেছে, তারপর সুরঞ্জন বারণ করে দিয়েছে তার বোনের সঙ্গে মেলামেশা করতে। তারপর সুবীরকে দু'এক মাস আগে দেখেছি। সন্ধ্যের পর বাংলা মদ খেয়ে রঙমহল থিয়েটারের সামনে হল্লা করতে।

সুবীর আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর উদারভাবে বললো, যাও খোকা, বাড়ি যাও। অতই যদি রস চাগিয়ে ওঠে, তা হলে নিজের পাড়ায় ভালো যন্তর নেই? বেপাড়ায় কেন?

অন্য ছেলেদের দিকে হাত তুলে বললো, চল চল যথেষ্ট হাতের সুখ করেছিস.— ।

আমার শরীরের ক্ষততে যেন নুনের ছিটে লাগছে। সুবীরকে কে বলেছিল আটকাতে? ওরা মারতো ওদের যত খুশী, সুবীরের তাতে কী? ঐ সুবীরকে একদিন আমি দেখে নেবো।

বুক পকেটটা টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে, নাক দিয়ে পড়ছে রক্ত, ডান কানের পেছন দিকটায় সূচ বেঁধানেরা মতন ব্যথা, সারা গায়ে ধুলো। উঠে দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব ধুলো ঝেড়ে হাঁটতে লাগলুম সার্কুলার রোডের দিকে। মুখ থেকে থুঃ করে কাগজের মণ্ডটা ফেলে দিয়ে, রুমাল দিয়ে মুছতে লাগলুম মুখের রক্ত।

রাগ নয়, দুঃখ নয়, অভিমান নয় মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। পাড়ার মাস্তান মাত্রই কাপুরুষ হয়। ওদের একা লড়াই করার সাহস নেই। ওদের যে কেউ যদি আমার সঙ্গে একা লড়তে আসতো, তা হলে হারজিতের ব্যাপারে কিছু বলার থাকে না। ওরা শিয়াল–কুকুরের মতন এক সঙ্গে দল বেঁধে অন্য একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি আবার একলাই আসবো রাণীদের বাড়িতে, সেদিন ঐ ছেলেগুলোকে অনুতাপ করতে হবে।

সার্কুলার রোডের মোড়ে এসে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। বাড়ি গিয়ে জামাটা পাল্টাতে হবে। তার জন্য এক্ষুণি কোনো ব্যস্ততা নেই, অনেক সময় আছে।

রাস্তার উল্টোদিকের ফুটপাথে ওটা কী? একটা ময়ূরই তো, ময়ূরকণ্ঠী গলা, বিরাট লম্বা পুচ্ছ, রাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে পা ফেলেছে। এপাশ–ওপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মানুষ, কেউ দেখছে না একটা ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে ফুটপাথে?

আমার একটা ময়ূরের পালক দরকার। ময়ূরের গা থেকে কি পালক তুলে নেওয়া যায়। কিংবা যদি আপনিই খসে পড়ে···আমি রাস্তা পেরুবার জন্য পা বাড়াতেই যেন ময়ূরটা টের

পেয়ে গেল আমার মনের কথা! একবার এদিকে তাকিয়েই তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে দু'বার ডেকে উঠলো ক্যাঁও! ক্যাঁও! তারপরেই উড়াল দিল, নতুন শেখা কোনো সাঁতারুর মতন ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে গিয়ে বসলো সাহিত্য পরিষদ ভবনের ছাদে! আর কেউ ময়ূরটাকে দেখলো না, শুধু আমি একা দেখলুম ?

রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে আমি একটা ময়ূরকে দেখেছি, এ বাড়ির ছাদ থেকে অন্য বাড়িতে উড়ে যেতে। রাস্তার ছেলেরা ভিড় করে সেটাকে দেখে। সেটা শোভাবাজার রাজবাড়ির ময়ূর, মাঝে মাঝে বাইরে বেরিয়ে আসে। সেই ময়ূরটাই কি এত দূর চলে এসেছে। কিংবা কলকাতার আকাশে আরও স্বাধীন ময়ূর আছে ? সে যাই হোক, এখানে ময়ূরটাকে গ্রাহ্যই করলো না।

যেখানে ময়ূরটা ছিল, সেখানে একটি লোক দূর থেকে হেঁটে আসতে আসতে থমকে দাঁড়ালো। সাদা প্যান্ট আর সাদা হাফ শার্ট পরা, মাথায় বড় বড় চুল এলোমেলো, কিছু যেন মনে করার চেষ্টা করছে লোকটি। খুব চেনা চেনা লাগছে, কোথায় যেন দেখেছি একে ? তিরিশ–একত্রিশ বছরে বয়েস···ও এই তো কয়েকদিন আগে দেখেছিলাম, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের বাইরে একটা রেলিং–এ ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। একে ঠিক আমার মতন দেখতে।

শরীরটা শিরশির করে উঠলো। আমার মতন দেখতে একজন মানুষ···এই দুপুরবেলা ও এখানে কী করছে ? লোকটা কি একা একা সারা শহর ঘুরে বেড়ায় ?

লোকটি এদিকে তাকালো··· আমাকেই খুঁজছে নাকি ? আমি চট করে মুখটা ফিরিয়ে নিলুম। আমি ওকে দেখা দিতে চাই না, বিশেষত এই অবস্থায়···ওর পরিষ্কার জামা–প্যান্ট··· আমার বুক পকেট নেই!

পর পর দুটি ট্রাম দু'দিক দিয়ে চলে যাবার পর দেখলুম, সেই লোকটি আর নেই সেখানে, কিছুটা দূরে দেখতে পাচ্ছি ওর পিঠ। যেদিক দিয়ে এসেছিল, সেই দিকেই ফিরে যাচ্ছে।

—ঠিক সামনের বাস স্টপেই একটা বাস থেকে নামলেন নিখিলদা। আমার আগে উনিই দেখতে পেলেন আমায়।

—আরে, নীলু, তোকেই তো খুঁজছি! তুই এর মধ্যে একদিন আমার বাড়িতে গিয়েছিলি ?

—নিখিলদা ? আপনি জেল থেকে ছাড়া পেলেন কবে ?

—এই তো পরশু! তুই এখানে একলা দাঁড়িয়ে আছিস যে ?

—এমনিই। বোধ হয় আপনার সঙ্গে দেখা হবে বলেই।

নিখিলদা একবার সাবধানে এদিক–ওদিক তাকালেন। আমার মাথার চুল এলোমেলো, জামা ছেঁড়া, মুখে রক্তের অস্পষ্ট দাগ, এসব উনি লক্ষ্যই করলেন না।

—এখানে ঠিক কথা বলা যাবে না। তুই আমার সঙ্গে একবার যেতে পারবি ? এক্ষুণি ?

—হ্যাঁ। কোথায় ?

—আমি এদিকে এসেছিলাম পরেশনাথের মন্দিরের কাছে একজনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য, থাক, সেখানে আর যাবো না এখন, তুই চল আমার সঙ্গে।

একটা চলন্ত ট্যাক্সি হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে নিখিলদা বললেন, ওঠ।

কোনো দ্বিধা না করে আমি উঠে পড়লুম নিখিলদার সঙ্গে ট্যাক্সিতে। সন্ধ্যেবেলা যদি টিউশানি না যাওয়া হয়, যাবো না! নিখিলদাকেই আমার সবচেয়ে বেশি দরকার।

ট্যাক্সিতে উঠে নিখিলদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তুই ধরেছিস নাকি ? তা হলে খেতে পারিস আমার সামনে, লজ্জার কিছু নেই –

সত্যিই এসময় একটা সিগারেট আমার খুবই দরকার। নিখিলদার প্যাকেট থেকেই একটা নিয়ে ধরালুম! নিখিলদাকে আগে কখনো সিগারেট খেতে দেখিনি আমি। বোধ হয় জেলে গিয়ে এই অভ্যাসটি হয়েছে। জেলে তো সময় কাটানোই বিরাট সমস্যা।

— নিখিলদা, সুদীপাদি কি ···

— হ্যাঁ, সুদীপা চেকোশ্লোভাকিয়া গেছে, তিন বছরের আগে ফিরবে না।

— নিখিলদা, আপনি হঠাৎ জেলে···

নিখিলদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় বললেন, চুপ। ট্যাক্সির ড্রাইভার আর তার পাশে একজন সঙ্গী বসে আছে। ওদের শুনিয়ে নিখিলদা কিছু আলোচনা করতে চান না।

ট্যাক্সিটা দক্ষিণেশ্বরে আসবার পর একটা চায়ের দোকানের সামনে নিখিলদা সেটা থামাতে বললেন। পকেট থেকে এক গোছা টাকা বার করে মিটিয়ে দিলেন ভাড়া। তারপর বললেন, সামনে এই যে বাগানবাড়িটা দেখছিস, এর গেট দিয়ে না ঢুকে বাঁ পাশের পাঁচিলের ধার দিয়ে হেঁটে যা। পাঁচিলটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবি।

নিখিলদা হাঁটতে লাগলেন উল্টোদিকে।

ওর নির্দেশ মতন সেই পাঁচিলটার শেষ প্রান্তে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম চুপ করে। বাড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার পেছনে অনেকখানি ফাঁকা জমি।

— এই নীলু, নীলু, এদিকে আয়!

তাকিয়ে দেখলুম, বাড়িটার দোতলার একটা ঘরের জানলা থেকে নিখিলদা হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। বাড়িটা অনেক কালের পুরোনো। পেছন দিকে মেথরদের যাওয়ার সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলুম দোতলায়। রীতিমতন ভাঙাচুরো অবস্থা, বাড়িটার, অনেক জায়গায় দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়েছে, ছাদেরও কিছুটা অংশ ফাঁকা, বড় বড় বট-অশ্বত্থ গাছ গজিয়ে আছে এখানে-ওখানে। এর মধ্যে সাপ-খোপ থাকাও বিচিত্র কিছু নয়।

নিখিলদা যে-ঘরটায় রয়েছেন, সেখানে একটা মাদুর ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। পাশে আর একটা দরজা-খোলা ঘর। বোঝা যায় সেটা বাথরুম।

মাদুরে বসলুম নিখিলদার সঙ্গে! এই পরিবেশ দেখে আমার শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। এবার তা হলে নিখিলদা সত্যিই কিছু বড় ব্যাপার করতে চলেছেন।

নিখিলদা বললেন, নীলু, তুই সেই বলেছিলি না পৃথিবীটা বদলাবার কথা ? মনে আছে ? এবার আমরা সেই কাজে নেমে পড়েছি। আর শুধু বক্তৃতা কিংবা ধর্মঘট নয়। কিন্তু তোকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি তো ?

— নিশ্চয়ই নিখিলদা···

— আমরা যে দল গড়েছি তার মধ্যে যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার আমরা জিভ কেটে নিই। এর মধ্যেই একজনের জিভ কেটে নেওয়া হয়েছে।

— আমায় যা খুশী শাস্তি দেবেন, কিন্তু কোনোদিন তার দরকার হবে না। আমি হয়তো কাজে ভুল করতে পারি, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করবো না কোনোদিন।

—তোর মতন ছেলেই আমাদের দরকার। আমরা সারা দেশে বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে চাই···সশস্ত্র বিপ্লব, এর জন্য তোকে আমাকে সবাইকে হাতিয়ার ধরতে হবে···যতদিন না কাজ শেষ হয়, ততদিন বাড়ির সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ রাখা চলবে না। তুই পারবি ?

—নিশ্চয়ই!

—বোস, আমাদের দলের অনেকেই আসবে খানিক পরে। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। কয়েকজনকে তুই চিনিস। আর কয়েকজনকে দেখে তুই অবাক হয়ে যাবি।

—আমরা কি কলকাতার কাছাকাছি থাকবো ?

—না, না, বললুম না, ছড়িয়ে পড়তে হবে সারা দেশে। তোকে আমি পাঠাবো পাহাড়ী এলাকায়—।

—আমি এক্ষুণি যেতে রাজি আছি।

—জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে, তৈরি থাকতে হবে যে মৃত্যু আসতে পারে যে-কোনো সময়···শাসক শ্রেণীতে পুলিশ বা মিলিটারির হাতে আমরা কেউ কোনোদিন ধরা দেবো না···সেই জন্যই জীবনের ওপর কোনো মায়া থাকলে···।

—আমার জীবনের কী দাম আছে নিখিলদা ? তবু যদি পৃথিবীটা বদলাবার জন্য কিছুটা কাজ অন্তত করে যেতে পারি····।

—পৃথিবীর কথা থাক, আপাতত আমরা নিজেদের দেশটার কথা ভাবছি।

—সুদীপাদি এই সময় বিদেশে চলে গেলেন।

—নীলু, সুদীপা সম্পর্কে আর একটা কথাও তুই জিজ্ঞেস করতে পারবি না আমায়। মনে থাকবে ?

—আচ্ছা নিখিলদা—

হঠাৎ উঠে পাশের বাথরুমটায় চলে গেলেন নিখিলদা। সিস্টার্নের ঢাকনাটা সরিয়ে তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কী যেন একটা বার করে আনলেন। আবার ফিরে এসে হাতটা মেলে বললেন, এ জিনিস কখনো হাতে নিয়ে দেখেছিস ?

একটা রিভলবার!

আমি যন্ত্রচালিতের মতন রিভলবারটা তুলে নিলাম নিজের হাতে। নিখিলদা জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, সাবধান, দেখিস ওটা লোড করা আছে কিন্তু— এদিকে আয়, তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি—।

নিখিলদা শিখিয়ে দিলেন কী ভাবে রিভলবার চালাতে হয়। তারপর বললেন, ঐ তাল গাছের মাথা টিপ করে গুলি চালা তো, দেখি, পারিস কিনা ?

—শব্দ হবে যে, লোকেরা শুনতে পাবে ?

—দূরে একটা কারখানার দড়াম দড়াম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস না ? ঐ জন্যই কেউ লক্ষ্য করবে না, এই তো এই জায়গাটার সুবিধে। নে, চোখ বুজে দেখে নে।

উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁপছে। কোনোদিন রিভলবার ছুঁয়ে দেখি নি। মনে মনে অবশ্য অনেকবার চালিয়েছি ডিসুম ডিসুম করে। সেই ছেলেবেলা থেকে। তাল গাছের মাথাটার দিকে আমার স্থির দৃষ্টি।

নিখিলদা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, তোকে বললুম না। দু'একজনকে দেখে তুই চমকে যাবি ? তোর বন্ধু সুরঞ্জন, তার বোন রাণী আমাদের গোপন দলে যোগ দিয়েছে।

— অ্যাঁ ?

এমনই চমকে গিয়েছিলুম যে রিভলবারের নলটা ঘুরে চলে এসছিল আমার বুকের দিকে। নিখিলদা ধরে ফেলে বললেন, কী করছিস্, মরবি নাকি! সে সব কথা তোকে পরে বলবো। এখন চালা তো গুলি, ঐ দিকে, ঐ যে তাল গাছের মাথাটা — ।

আমি আবার রিভলবারটা শক্ত করে ধরে টিপ ঠিক করলুম। তারপর ট্রিগার টেপার আগের মুহূর্তে বললুম, কিন্তু ঐ গাছটার ডগায় যে একটা বড় পাখি বসে আছে···পাখি তো নয়, একটা ময়ূর!

নিখিলদা বললেন, ময়ূর? কই ? দূর পাগল, ওটা তো একটা শকুন!

কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখছি ময়ূর। এ কি সেই সার্কুলার রোডের ময়ূরটা, এত দূরে উড়ে এসেছে ? ও কি চায় ?

— কই, মার!

— নিখিলদা, একটা ময়ূরকে মারবো শুধু শুধু ?

— বলছি না, ময়ূর নয়, শকুন! মনে কর, ঐ শকুনটাই শ্রেণী শত্রু, দেখি কেমন মারতে পারিস — ।

গুড়ুম!····

একটা লরির টায়ার ফেটেছে। শব্দ একই রকম।

আমি দাঁড়িয়ে আছি রাণীর পড়বার ঘরের ডান দিকের জানালার বাইরের গলিতে। রাণী ঘরে নেই। টেবিলে বইপত্র ছড়ানো, একটা কলম খোলা। একটু পরেই রাণী আসবে নিশ্চয়ই!

রাস্তা একেবারে ফাঁকা, আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই মনে হয়। পড়ার ঘরটা রাণীর প্রতীক্ষায় কাঁপছে, আমার মতন। রাণী আসবে, একটু বাদেই এসে পড়বে।

এখন দুপুর তিনটে, শুক্রবার। সামনের মঙ্গলবার আমি বাইশ বছর বয়েসে পা দেবো। তখন এ সব কিছুই বদলে যাবে! বদলে যেতে বাধ্য।

সমাপ্ত